আল্ বাহি আল্ খাওলী

নারী ইসলামের দৃষ্টিতে

২

নারী ঃ
ইসলামের দৃষ্টিতে

(২য় খণ্ড)

আলবাহি-আল খাওলী (মিসর)

অনুবাদ ঃ— মোহাম্মদ নূরুল হুদা (ভারত)

সিন্দাবাদ প্রকাশনী
SHINDABAD PROKASHONI

: সূচীপত্র :

হালালার শর্তাবলী	১৬১
হালালার অর্থ	১৬১
হালালার বিধিনিষেধ	১৬২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—	
নারী–মা ও স্ত্রী হিসেবে	১.৫
বিবাহ বিধি	১৬৮
বিবাহ বিধির উপকারিতা	১৬৯
মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি	১৭৩
মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির উপকারিতা	১৭৭
বিবাহ বিধি ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়নের শর্ত	১৮০
মায়ের অধিকার	১৯২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—	
পর্দা	১৯৮
উম্মুল মু'মেনিনদের পর্দা	১৯৯
মুসলিম নারীর পর্দা	২০২
ঘর সংসারের মর্যাদা	২১৬
নারীর রূপলাবণ্য ও সাজসজ্জা	২২০
পোষাকের সৌন্দর্য	২২২
সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহার	২২৩
সাজসজ্জার পদ্ধতি	২২৪
কৃত্রিম পদ্ধতি	২২৫
স্বাভাবিক পদ্ধতি	২২৬
নারীর সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্যেই হওয়া উচিৎ	২২৬
মেলামেশা	২২৭
বাইরের মেলামেশা	২২৮
থিয়েটার সিনেমা	২২৯
ভ্রমণকেন্দ্র ও পার্ক	২২৯
সাধারণ যানবাহন	২৩০

: সূচীপত্র :

হালালার শর্তাবলী	১৬১
হালালার অর্থ	১৬১
হালালার বিধিনিষেধ	১৬২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—	
নারী–মা ও স্ত্রী হিসেবে	১৬৫
বিবাহ বিধি	১৬৮
বিবাহ বিধির উপকারিতা	১৬৯
মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি	১৭৩
মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির উপকারিতা	১৭৭
বিবাহ বিধি ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়নের শর্ত	১৮০
মায়ের অধিকার	১৯২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—	
পর্দা	১৯৮
উম্মুল মু'মেনিনদের পর্দা	১৯৯
মুসলিম নারীর পর্দা	২০২
ঘর সংসারের মর্যাদা	২১৬
নারীর রূপলাবণ্য ও সাজসজ্জা	২২০
পোষাকের সৌন্দর্য	২২২
সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহার	২২৩
সাজসজ্জার পদ্ধতি	২২৪
কৃত্রিম পদ্ধতি	২২৫
স্বাভাবিক পদ্ধতি	২২৬
নারীর সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্যেই হওয়া উচিৎ	২২৬
মেলামেশা	২২৭
বাইরের মেলামেশা	২২৮
থিয়েটার সিনেমা	২২৯
ভ্রমণকেন্দ্র ও পার্ক	২২৯
সাধারণ যানবাহন	২৩০

চতুর্থ অধ্যায়—

নারীর অধিকার ও দায়িত্ব ২৩১
নারীর উত্তরাধিকার ২৩২
ইসলামই সর্ব প্রথম মেয়েদের উত্তরাধিকার দান করে ২৩৩
ত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে কয়েকটি কথা ২৩৬
মেয়ের অংশ ছেলের অর্দ্ধেক কেন ? ২৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

নারী শিক্ষা উপস্থাপনা ২৪২
ছেলেমেয়ে—সমান গুরুত্ব ২৪৩
শিক্ষা (ফরয) অপরিহার্য ২৪৬
নারীর শিক্ষাক্ষেত্র ও সীমা ২৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

মহিলাদের চাকুরী : প্রথম কথা ২৫৬
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ২৫৮
জাতির উন্নতি ২৬৪
নারী গৃহপ্রদীপ না বাজারের পণ্য ? নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ২৮০
অর্থোপার্জনে নারীর দুর্বলতার মানে ২৮২
নারীদের কর্মতৎপরতা ও ইসলাম ২৯১
মহিলাদের চাকরী-বাকরী ২৯৭
কর্ম—মহিলাদের স্বাভাবিক অধিকার ৩০৬
মহিলাদের উৎপাদনশীল ক্ষমতা ৩০৮
পরিশিষ্ট ৩১৪

হালালার শর্তাবলী

ইমাম-মুজতাহেদীনদের ধারণা মোতাবেক, তিন তালাক দেয়ার পর স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্যে কেবল তখনি হালাল হতে পারে যখন সে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ করবে—তা হচ্ছে ঃ

(১) প্রথম স্বামীর তালাক দেওয়ার পর সে ইদ্দত পালন করবে।
(২) এরপর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে যথার্থ বিয়ে করবে।
(৩) এবং তাদের উভয়ে মধ্যে সহবাস (দৈহিক মিলন) হবে।
(৪) এরপর সে তাকে তালাক দেবে।
(৫) এবং সে আবার ইদ্দত পালন করবে।

এরপর যদি প্রথম স্বামী চায় এবং সে নিজেও সম্মত হয় তাহলে উভয় আবার বিয়ে করতে পারে।

হালালার অর্থ

সাধারণতঃ এমন হয় যে সাময়িক উত্তেজনার শীকার হয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, এরপর যখন অবস্থা সংগীন হয়ে উঠে, তার পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা তছনছ হয়ে যায় এবং স্ত্রীর বিচ্ছেদ তার জন্যে অসহ্য হয়ে উঠে তখন সে শরীয়তের আইনের ফাঁক অনুসন্ধান করতে শুরু করে। সে এর একটি ব্যবস্থা এভাবে করে যে, কারো কাছে গিয়ে এটা ঠিক করে যে সে তার সাবেক স্ত্রীকে এই শর্তে বিয়ে করবে যে একবার সহবাস করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে, এভাবে সে তার সাবেক স্ত্রীকে নিজের জন্যে হালাল করার পন্থা খুঁজে এবং মনে করে যে সে শরীয়তের বিধানের অনুসরণ করে অথচ আসল কথা হচ্ছে এভাবে সে শরীয়তের বিধানের সাথে ঠাট্টাই করছে।

এভাবে হালাল অর্থ যেন এই হয়—স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্যে হালাল করানো। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরনের কর্মের কর্তাকে মুহাল্লাল এবং যার জন্যে এই কর্ম করা হয়েছে তাকে মুহাল্লাললাহু বলা হয়।

হালালার বিধি-নিষেধ

উপরে হালালার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ। কারণ এতে করে কোরানের বর্ণিত শর্ত ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়না। আল্লাহ যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তা হবে স্বাভাবিক সার্বজনীন সুন্নাত মোতাবেক বিয়ে। বিয়ের নামে কোন নাটক অভিনয়ের কথা বলা হয়নি। যারা এই ধরনের উদ্দেশ্যপূর্ণ বিয়ের অভিনয় করে তার সাথে শরীয়তের নির্দেশিত বিয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নারী ও একটি পুরুষ নতুন আবেগ ও স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়ে নতুন জীবনের শুভসূচনা করে। এখানে উভয় উভয়ের সাথে আস্থা ও বিশ্বাসের শপথ ও প্রতিশ্রুতি দেয়। উভয় একে অন্যকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শান্তি ও স্বস্তি দান করে এবং পরস্পর পরস্পরকে আনন্দ-উল্লাসে উজ্জীবিত করে তোলে,— যেমন আল্লাহ বলেছেন—

> "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে তিনি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে থেকে জোড় সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া এবং রহমত সৃষ্টি করেছেন।" (রুম—২১)

এভাবে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশবিস্তার করা। পবিত্র কোরান এবং বিভিন্ন হাদীসে এর স্পষ্টিকরণ রয়েছে, যেমন এক হাদীসে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "অধিকতর প্রেমময়ী এবং সন্তান উৎপাদশীল নারীর সাথে বিয়ে কর যেন আমার উম্মতের বৃদ্ধি ঘটে।"

অন্য একটি হাদিস হচ্ছে—

> বিয়ে করে, বংশবিস্তার কর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাও যেন হাসরের দিন আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য জাতির মোকাবেলায় গর্ব করতে পারি।"

এজন্যে আমরা দেখতে পাই যে বিয়ের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাতে এতো বেশী ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা হয়! স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করা হয়। যেমন ভরণ-পোষণ-মোহর-বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা...।

বিয়ের বাস্তবতা কি এবং কিইবা তার উদ্দেশ্য? এ নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ থেকে অবশ্যই বিয়ে ও হালালার মধ্যোকর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। একদিকে বিয়ে হচ্ছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্ম, আর অন্যদিক হালালা হচ্ছে একটি নির্লজ্জ নাটক অভিনয়। প্রিয়নবী (স) বলেছেন "কর্ম তাঁর উদ্দেশ্য উপর নির্ভরশীল"। এবং হালালা সেই কর্ম যাতে কারো উদ্দেশ্যই মোহর আদায় করা বা একসাথে জীবনযাপনের থাকে না। এখানে পাত্র-পাত্রী কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না এবং বৈধ সন্তান উৎপাদনের কোন উদ্দেশ্যও তাদের থাকে না।

মোটকথা, বাহ্যতঃ হালালাকে বিয়ের মতো একটা রূপ দেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে বিয়ের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্কই থাকে না। এই জন্যে হালালাকে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে এক ধরনের খেলা তামাশা বলেই গণ্য করা যায়।

হযরত ওসমান (রা) বলেছেন' "বিয়ে এমন এক ব্যাপার যাতে কোন লুকোচুরি থাকে না।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরকে একব্যক্তি অন্য এমন একব্যক্তি সম্পর্কে জানালেন যে সে নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজেরই ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয়া যেন তার মাধ্যমে হালালা করা যায়। সে জিজ্ঞেস করলো' এভাবে কি মহিলাটি তার প্রথম স্বামীর জন্যে বৈধ হয়ে যাবে? ইবনে ওমর জবাব দিলেন, 'হবে না।' কারণ বিয়ে অন্য এক ইচ্ছার নাম। আমরাতো রসূলুল্লাহর আমলে এ ধরনের কাজকে (হালালাকে) যেনা বলে গণ্য করতাম।"

আর একই ভিত্তিতে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন হালালাকারী বা হালালাকারিণীকে যদি আমার আদালতে আনা হয় আমি তাদেরকে রজমের (পাথরবর্ষণকরে মৃত্যুদন্ড) শাস্তি দেবো।"

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী (স) হালালকারী এবং হালালাকারিনীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হালালা বৈধ বিয়ে নয় বরং ব্যভিচার। কেন না আল্লার রসূল বিয়েকারীদের উপর কক্ষনো অভিশম্পাত করতে পারে না, প্রিয়নবী (স) বরং বিয়েকে তিনি আশীর্বাদই করেছেন।

প্রিয়নবী (স) হালালাকারীকে "ভাড়াটে ষাঁড়" বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আকবা বিন আমের (রা) বর্ণনা করেছেন—
প্রিয়নবী (স) একবার সাহাবাদের বলেন—

"আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে বলবো না?
সাহাবারা বলবেন,—
"কেন নয় হে আল্লার রসূল।"
প্রিয়নবী (স) বললেন—
"সে হচ্ছে "মুহল্লল" হালালাকারী।
আল্লাহ তায়ালা মুহল্লল এবং মুহল্লাল্লাহু উভয়ের উপর অভিসম্পাৎ করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নারী—মা ও স্ত্রী হিসেবে

উপস্থাপনা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে নিছক নারী ও পুরুষের সহমিলনের নামই নয় বরং আসলে এটা সেই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং সেই বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার নাম যার বন্ধনে থেকে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক কামনা বাসনার পূর্ণতা অর্জন করে। পবিত্র কোরানের শিক্ষায় এই বাস্তব সত্য কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

একই কথা মাতৃত্বের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কোন নারী শুধু সন্তান উৎপাদন করেই মাতৃত্বের মর্যাদা পেতে পারে না। এটা আসলে সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির নাম যা নারীর অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। এরই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে যাচ্ছি। এ সম্পর্কে বুনিয়াদী নীতি পবিত্র কোরানের এই আয়াতেই নির্দ্ধারিত হয়েছে—

"এবং তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে সম-অস্তিত্ব স্ত্রীদের বানিয়েছেন এবং তিনিই ওসব স্ত্রীদের কাজ থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভাল ভাল দ্রব্যাদি তোমাদের খেতে দিয়েছেন।"

(নহল-৭২)

আমরা দেখতে পাই যে, পশু-পাখীরাও নর ও মাদী পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এবং এর মাধ্যমে তাদেরও বংশবিস্তার হয়ে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে অবিদিত নই যে, পাখীদের মধ্যেও মাতৃ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। তাদের মায়েরাও একটি বিশেষ মীয়াদ পর্যন্ত নিজের পেটে গর্ভধারণ করে রাখে। এর পর প্রসবের পরে সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহমমতা পোষণ করে, অত্যন্ত

যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করে, এবং খাওয়া ও থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে। মানুষ যদি ঠিক এটাই করে থাকে তাহলে জীবজন্তু, পশু-পাখী আর মানুষের মধ্যে পার্থক্যইবা কি থাকে ? উভয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থেকেই থাকে তাহলে তা হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা কেবল মানুষেরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদে বিয়ে শীর্ষক আলোচনায় এ দিকে ইঙ্গিত করেছি যে মানুষ দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রাণী হিসাবে তার জৈবিক মান যা তাকে প্রাকৃতিক আইনের আওতাভুক্ত রাখে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক মান যা তাকে সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করে এবং তার চারিত্রিক মূল্যবোধের বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধানের কোন ভূমিকা থাকে না। এর পরেও এটা কেবল আল্লাহ্‌র বিশেষ মেহেরবাণী যে এই দু'টি ক্ষেত্রে তিনি উভয়কে একে অন্যের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। জৈবিক দিক থেকে আল্লাহ্ মানুষকে নারী ও পুরুষে বিভক্ত করেছেন এবং উভয়ের সাংগঠনিক উপাদান এক হওয়া সত্বেও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি পেশীকোষও পরস্পর থেকে বিভিন্ন। একইভাবে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উভয়েই মানবিক গুরুত্ব বরাবর হলেও কার্য্যকারীতার দিক থেকে উভয়েই ভিন্নধর্মী। বলতে গেলে উভয়েই পরস্পর বিরোধী বা অন্য কথায় পরস্পরের পরিপূরক। ঠিক নেগেটিভ এবং পজিটিভের মতো। বিদ্যুতের জগতে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, যদি নেগেটিভ ও পজিটিভ উভয়েই সমভাবে কাজ না করে তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশ্নই উঠে না, কিন্তু এ পার্থক্য সত্বেও গঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে উভয়ে একই ধাতুর তৈরী। এটাই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিরহস্য। তিনি প্রতিটি বস্তুকেই জোড়ায় জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি জিনিষই পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন গুণাবলীর দিকেও ইঙ্গিত করেছি। যার সারমর্ম হল পুরুষ শান্তি ও স্বস্তির ব্যবস্থা করে এবং তার মাধ্যমে নারী শান্তি ও স্বস্তি

অর্জন করে। এ সম্পর্কে আমরা পবিত্র কোরানের ভাষ্যও পেশ করেছি। তাতে নারী ও পুরুষের শান্তি ও স্বস্তি অর্জনের ব্যাপারে উভয়ের আধ্যাত্মিক গুরুত্বও স্পষ্ট হয়েছে।

এ পর্যন্তকার আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষের দুটি দিক রয়েছে। একটি বাহ্যিক আর অন্যটি আভ্যন্তরীণ এবং এই উভয় ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উভয়ের অনেক বড় বড় গঠনতান্ত্রিক ব্যবধান রয়েছে যেমন নারীর নারী-সুলভ বিশেষ গঠন কাঠামো রয়েছে যার কারণে পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য এবং এই পার্থক্যের কারণেই নারী সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ সে সব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত। কিন্তু পুরুষের আলাদা যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নারীর নেই। এতে করে নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু এই পার্থক্য বা বৈপরীত্য ও স্বতন্ত্র মানবতার বংশবিস্তারের জন্য একান্তই অপরিহার্য। মানবজাতির স্থায়িত্ব নারী পুরুষের এই গঠনগত বৈপরীত্যের উপরেই নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা প্রতিনিয়তই এই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে পারি। নেগেটিভ ও পজিটিভ তারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কিন্তু এই পার্থক্যই হচ্ছে তাদের সম্মিলনের ভিত্তি। যদি তা না হতো তাহলে বিদ্যুৎ নামের কোন অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে কখনো পরিলক্ষিত হতো না। কোরানের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'বিবাহবিধি'। যেমন আল্লাহ বলেছেন—

"এবং প্রতিটি জিনিসকেই আমরা জোড়া জোড়া বানিয়েছি"।

বস্তুত এই জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের নির্দ্ধারিত সীমায় অবস্থান করে এবং এভাবে তারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় পর্যায়ে মানবজাতির জন্যে অধিকতর কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

—

বিবাহ বিধি

বিবাহ বিধির ইতিবাচকতা

মানব সমাজে নারী ও পুরুষের মান তাদের সব সামঞ্জস্যতা সত্বেও ইতি ও নেতিবাচকতায় বিভক্ত। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একে অন্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য হলো উভয়ে নিজের আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ফলপ্রসূ প্রমানিত হওয়া। এজন্যে এই পার্থক্যটা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় বরং বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জনেরই একটি উপায় এবং উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। এই বিবাহ বিধির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন—

> "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই সত্তা থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর। এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।" (রূম-২১)

এখানে শান্তি বা তৃপ্তির অর্থ আবেগ-প্রবণ অথবা যৌন তৃপ্তি নয় যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকে, আসলে এর অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি। ইমাম রাজী এই শান্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এটা আন্তরিকতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আধ্যাত্মিক অথবা আন্তরিক শান্তি প্রকাশ্য হয় না বরং অদৃশ্য হয়। এর সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত।

যাই হোক, কোরানের উল্লেখিত আয়াতে শান্তির অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি, যার অন্বেষণ পুরুষ মাত্রই করে থাকে এবং বিয়ের অর্থ আধ্যাত্মিক বিয়ে এবং অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, নারী ও পুরুষ উভয়ে মানুষ হিসাবে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের মধ্যেকার যে পার্থক্য রয়েছে তা মানবতার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

এতে করে বিয়ের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এটা যথার্থভাবে জানা যায় যে বিয়ের অর্থ শুধু দুটি দেহের মিলন নয় বরং দুটি আত্মার মিলন। আর আত্মার সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের মাধ্যম হিসেবে দৈহিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। মূলতঃ আধ্যাত্মিক মিলনটাই মুখ্য এবং দৈহিক মিলনটা গৌণ।

বিবাহ-বিধির উপকারিতা

এই পুরো আলোচনায় বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে 'বিবাহ বিধির উপকারিতা'। পৃথিবীর যে কোন কাজকর্ম তা আধ্যাত্মিক হোক বা বস্তুগত—একটি নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্যের অধীনেই করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানে 'বিবাহ বিধির উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন—

> "যেন তোমরা শান্তি অর্জন কর এবং তোমাদের মধ্যে দয়া ও ভালবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।"

অর্থাৎ, এই যে যখন দুই দেহের মিলন হয় তখন বংশবিস্তার ঘটে আর যখন দুই আত্মার মিলন হয় তখন তার ফলশ্রুতিতে শান্তি, ভালবাসা, এবং দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

অতএব আমরা প্রত্যক্ষ করি যে—মানবতার যে বীজ মানব অস্তিত্বেই সুপ্ত থাকে তাতে আত্মসঞ্জীবতা অর্জনের এবং সাফল্য লাভের কোন ক্ষমতা থাকে না তাকে বিবাহে বিধিই শক্তিসঞ্চার করে এবং তার ক্রমবৃদ্ধির সুযোগ সরবরাহ করে, এমনকি এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই বীজ একটি বিরাট বৃক্ষের রূপ ধারণ ক'রে একদিন তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠে। এরই ফল-ফুলের মিষ্টি সৌরভে মুগ্ধ উদ্বেলিত হয়ে উঠে মানবতার মনমেজাজ।

যদি কোন দুর্ভাগা মানুষের জীবনে এই ফুল আর ফল দেখা না দিয়ে থাকে, যদি সে তার মিষ্টি ঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি মানবাত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে কোন দিনই পরিচয় লাভ করতে পারবে না। তার অস্তিত্ব মানবিকতার মহোত্তম উপলব্ধি থেকে আজীবন বঞ্চিত থেকে যাবে। ফলে সে মহাপ্রকৃতির এমন এক নির্জীব ধূলোর মতো পড়ে থাকে যার না

আছে কোন উদ্দেশ্য আর না আছে কোন মর্যাদা। একইভাবে কোন সমাজ যদি এই মানবিকতার আভ্যন্তরীণ গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞাত ও অপরিচিত হয়ে থাকে, যদি তার মানমর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনবিহিত হয়ে থাকে তাহলে সেই সমাজকে আধ্যাত্মিকভাবে নির্জীব ও সারশূন্য সমাজ বলতে হবে। সেই সমাজ উন্নত মানবিক গুণবৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী মৌলিক উপাদান থেকে বঞ্চিত বলেই বলতে হবে।

ইমাম রাজীর দৃষ্টিকোণ থেকে—, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার প্রেম-প্রীতি ও মানবিকতার অনুভূতি হচ্ছে তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগেরই প্রত্যক্ষ ফলাফল। তাঁর মতে এসব মহৎ ও পবিত্র অনুভূতি যৌন সম্পর্কের ফলশ্রুতি হতেই পারে না। বস্তুত এটা একটা প্রাকৃতিক বিধি, যা আল্লাহর আদেশে প্রতিটি মানুষের মনে ঢেলে দেয়া হয়েছে। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন অনন্য অনবদ্য প্রীতিভালবাসার সৃষ্টি হয় যা অন্য কারো সাথে হয় না তা সে যতই আপন হোক না কেন। আসলে এটা হচ্ছে আল্লারই বিশেষ দান—যা তিনি স্বামী স্ত্রীকে দান করে থাকেন।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী তাঁর 'তফসীরে কবীরে' আরো লিখেছেন—"স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দয়ামায়া ভালবাসা ও একের জন্যে অন্যের প্রতি যে ত্যাগতিতিক্ষার আবেগ-অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় তা অন্য কোন আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের মধ্যেও হয় না। এসব আবেগ অনুভূতি নিছক যৌন সম্পর্কের ফল্যফল নয়। কারণ যৌনপ্রবণতা তো যৌবন ঢলে পড়ার সাথে-সাথে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার আবেগ-অনুভূতি বয়সের সাথে সাথে আরো বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা লাভ করে। এটা এই জন্যেই হয় কারণ তা আল্লারই দেয়া দান। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি কেবল যৌন-সম্পর্কই হতো তাহলে উভয়ের জীবন চরম তিক্ততা ও বিরক্তিতে ভরে যেত এবং তালাকের মাত্রা অধিকতর হতো। সুতরাং বলতেই হবে যে ভালবাসার এই আবেগ আল্লার পক্ষ থেকেই দান করা হয়। কেবল চিন্তাভাবনাকারী জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন।—এই বাস্তবতাকেই আরো স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ বলেছেন—

"নিঃসন্দেহে, চিন্তাভাবনাকারীদের জন্যে এতে বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।" (কোরান)

ইমাম রাজীর উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মতেও স্ত্রীর ভালবাসার আবেগ-অনুভূতি যৌনতৃপ্তির ফলাফল নয়। তিনি পরিস্কারভাবে এটাকে আল্লার রহমতেরই বিশেষ অবদান বলে ঘোষণা করেন। এতে বুঝা গেল যে, তাঁর কাছেও দাম্পত্যের অর্থ হ'ল আধ্যাত্মিক দাম্পত্য। এটা হচ্ছে মহাপ্রকৃতির স্রষ্টারই প্রবর্তিত বিধি যা সরাসরি মানবআত্মার সাথে সম্পৃক্ত। এই স্রষ্টা-প্রদত্ত বিধিই আত্মাকে করে সজীব এবং তার মধ্যে প্রেম-প্রীতি দয়া ও মহানুভবতার সৃষ্টি করে। জড়বাদিতার এই সংসারে এই বিধির যথার্থ নামকরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এটা এমন এক মহান পর্যায়ে, যেখানে পেঁছানোর জন্যে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধিকে আরো উদার ও প্রশস্ততর করতে হবে। তাছাড়া এর ব্যাপকতা ও গভীরতার অনুমান করা আমাদের পক্ষে মুশকিল হবে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সীমার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থেকে কেবল যৌন তৃপ্তি ও দৈহিক আনন্দ অর্জন পর্যন্তই সীমিত থেকে যাবে। এজন্যে আল্লাহ্ আমাদের চিন্তাভাবনাকে গভীরতর ও ব্যাপকতর করার উপদেশ দিয়েছেন।

সুতরাং এই বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ অবগতি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী এবং আমাদের দাম্পত্য জীবনে সেই সত্য সচেতনতাকে জাগ্রত ক'রে সেসব উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে আমাদের মধ্যে সত্যিকার প্রেমপ্রীতি ভালবাসা ও ত্যাগতিতিক্ষার আবেগ সৃষ্টি হয়। আমরা যেন নিছক যৌন সম্ভোগ আর দৈহিক আনন্দের সংকীর্ণ সীমানায় সীমিত না থাকি বরং আমরা যেন একে অন্যের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি- ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির পক্ষে বা বিপক্ষে যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনা করা উচিৎ যাতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে আমরা পরস্পরের কতটুকু নিকটে আছি এবং আল্লাহ্ আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমরা তার কতটুকু পালন করছি? শুধু বিয়ে করে অথবা নিজের পারিবারিক অঙ্গনকে হাসি-খুশীতে ভরে দিলেই আমাদের অধিকার

ও দায়িত্ব পালনের কাজ শেষ হয়ে যায় না। স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে এটা জেনে নিতে হবে যে তাদের প্রীতিভালবাসাপূর্ণ সম্পর্কের বুনিয়াদ কি ? তারা যদি একথা অনুভব করে থাকে যে এই ভালবাসার সম্পর্ক মানবিক বাসনা, রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও উন্নত মানবিক মূল্যবোধের পরিণতি—তাহলে তাদের জানা উচিৎ যে, এটাই সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক যাকে আল্লার কোরানে ভালবাসা ও দয়ার নাম দেয়া হয়েছে,—এ সম্পর্ক নিঃসন্দেহে কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। কিন্তু এছাড়া সম্পর্কের বুনিয়াদ যদি অন্য কিছু হয় তাহলে জেনে রাখতে হবে যে এই সম্পর্ক আর এই ভালবাসা কোনদিনই কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে না। কেন হবে না—তার কারণ নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করবো।

—

মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি

মা ও সন্তানের মধ্যেকার প্রীতি-স্নেহের সম্পর্ক মানুষের প্রকৃতিগত ; বস্তুগত বা বৈষয়িক দৃষ্টিকোন থেকে এর কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। এটাও সম্পূর্ণভাবে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এই জন্যেই এই সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তিশীল। দুনিয়াতে এমন কোন মানদন্ড নেই যার মাধ্যমে মা ও সন্তানের মধ্যেকার প্রীতি-সম্পর্ককে ওজন করা যায়। আমরা কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে এসব এমন এক প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে হচ্ছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তার আসল লক্ষ্য সহজে অর্জন করতে পারে। আর যেহেতু এই সম্পর্কের মূল হচ্ছে হৃদয় তাই আল্লাহ্ পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হৃদয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন—

—"ওদের কাছে হৃদয় আছে, কিন্তু তারা ভাবনাচিন্তা করে না।" (আরাফ-১৭৯)

—"তিনিই যিনি মু'মেনদের হৃদয়ে স্বস্তি নাজিল করেছেন।" (ফাতাহ-১৪)

—"শীগগীরই আমি কুফরকারীদের হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি করবো—।" (আনফাল-১২)

—"এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। অতঃপর এটা পাথরের মতো হয়ে যায়।" (বাকারা- ৭৪)

—"এরপর তাদের দেহ ও তাদের হৃদয় কোমল হ'য়ে আল্লার জিকিরের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠে।" (জুমর-২৩)

—"ওসব (আগের পরের) পথভ্রষ্টদের হৃদয় একই রকম।" (বাকারা-১১৮)

—"এবং আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ের কথা জানেন এবং তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।" (আহ্যাব-৫১)

হৃদয় বলতে সাধারণ অর্থে মানুষের বক্ষ তলের হৃদপিন্ডকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু পবিত্র কোরানে হৃদয়ের অর্থ কোন বিশেষ অঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়নি বরং কোরানের দৃষ্টিতে তার অর্থ মানব-প্রকৃতির সেই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ সাধারারণ প্রাণী থেকে অনেক উপরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়ে থাকে। এরই মাধ্যমে মানুষের মধ্যে খোদাপ্রেম-খোদাভীতি এবং তার সান্নিধ্য অর্জনের আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। এই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক বাস্তবতা যার প্রভাব আমরা অনুভব করতে পারি কিন্তু তার আসল অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্ণ অবগতি অর্জন করতে পারিনা, কারণ এর সম্পর্কে মানুষের আভ্যন্তরীণ আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

মানুষের হৃদয় খোদার আঙ্গুলির মাঝখানে রয়েছে।" (আহ্মদ)

আল্লার কোরানেও একই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে—

"জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝখানে রয়েছেন।" (আনফাল-২৪)

এই হচ্ছে বাস্তবতা আর বিধিবিধান যা মানুষের বিবেকে ক্রিয়াশীল থাকে আর এই উদাহরণের মাধ্যমেই আমরা বিবাহবিধি এবং মা ও সন্তান-সংক্রান্ত বিধি বুঝতে পারি।

এভাবে মাতৃত্ব বলতে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব আর দুধ খাওয়ানোকেই শুধু বুঝাবেনা বরং মাতৃত্বের স্থান আরো উপরে; ঠিক আধ্যাত্মিক পর্যায়ের। মা কেবল গর্ভধারণ আর লালন পালনই শুধু করবে না বরং তাঁর সন্তানকে চারিত্রিক গুণাবলীতেও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেন। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তার সন্তানকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। এই সত্যিকারের মানুষই বিশ্বমানবতার মঙ্গল ও কল্যাণের পথ সুগম করে। পবিত্র কোরানে

আল্লাহ্ বলেন—

"এবং তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সত্তা থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেইসব স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও পৌত্রাদি তোমাদের দান করেন এবং ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য তোমাদের দান করেন।" (নহল—৭২)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন—

"তোমার প্রতিপালক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে তোমরা কারো এবাদত করবে না কিন্তু শুধু তাঁর। মাতা পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা যদি তোমাদের কাছে তাঁদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়জন বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন তাহলে তাদের "উহ্" পর্যন্ত বলবে না, তাচ্ছিল্যের সাথে কথা বলবে না বরং তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং নম্রতা ও দয়ার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং দোআ করবে যে, "(হে)! প্রভু! এ'দের প্রতি রহমত নাযেল কর, যেভাবে তাঁরা রহমত ও স্নেহের সাথে আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।" (বনী-ইসরাইল-২৩, ২৪)

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মাতা পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাঁদের সেবার যত দিক ও পর্যায় থাকতে পারে তার সব দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি এ সব কিছুকেই নিজ এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মণীষী ফখরুদ্দীন রাজী বলেন, "মাতা পিতার আনুগত্য এবং আল্লাহ্র এবাদতের দিকে এই তীব্র তাগিদের আসল কারণ হচ্ছে মানব সৃষ্টির আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা সর্ব প্রথম তাঁকেই সম্মান দান এবং তাঁরই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এর পরই মাতা পিতার প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছেন। এতে করে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় পিতা-মাতার অনুগত্য করা বস্তুতঃ আল্লাহ্র ইবাদতেরই এক পবিত্রতম অঙ্গ। যেমন, পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে বলা হচ্ছে—

"এবং বাস্তব কথা এই যে আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্যে নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে ধারণ করেছে এবং দুই বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এজন্যে আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

(লোকমান—১৪)

উপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এমনকি মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আল্লার শোকর আদায়ের সাথে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এভাবে মাতা-পিতার সেবাও ইবাদাতের মান পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একটি বিশেষ দিকনির্দেশ এই দিয়েছেন যে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে আনুগত্যের খোদায়ী পদ্ধতি; এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতার সেবার দায়িত্ব পালিত হয়। এ-প্রসঙ্গে ইমাম রাজী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা, তাঁর ছাড়া অন্য কারও উপাসনাকে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেবা হচ্ছে উপসনার পরববর্তী স্থান। এ থেকে দেখা যায় যে সেবা কেবল বৈধই নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরীও। যেমন মাতা-পিতার সেবা করা ওয়াজিব বা জরুরী।

মোটকথা সেবাপরায়ণতা এমন এক গুণ যা সন্তানের মনে মাতা-পিতার আনুগত্যের আবেগ সৃষ্টি করে। এই অনুভূতিতে উদ্বেলিত হয়ে সন্তান মাতা-পিতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এভাবে মাতাপিতার খেদমতের মাধ্যমেও সন্তান আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের সেবাপরায়ণতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং গভীর আন্তরিকতার ভাব আল্লাহ স্বাভাবিকভাবেই সকল মানুষের মনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিধি। সন্তান ও মাতাপিতার মধ্যেকার

এই সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তিশীল সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অনুপ্রেরিত হয়ে মাতাপিতা সন্তানদের লালনপালন করেন এবং সেই একই আধ্যাত্মিক অনুভূতির তাগিদে সন্তানও পিতামাতার সেবা ও সম্মান করে।

এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি আল্লাহই মানুষের মনে সৃষ্টি করেছেন। এই জন্যে আদিকাল থেকেই মাতাপিতার সেবা ও সম্মান করা সমগ্রমানবতার কাছে অন্যতম স্বাভাবিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সভ্য অসভ্য সব জাতির সব মানুষই এই একটি ব্যাপারে একই অনুভূতি পোষণ করে। এতে জানা যায় যে, এই অনুভূতিটি মানব প্রকৃতিতেই শামিল থাকে।

এই যে স্বভাবগত অনুভূতিতে সব মানুষই উদ্বেলিত, তার গোড়ায় পানি সেচ করেন কে? ...... তিনি হচ্ছেন মা। মা-ই তাঁর স্বাভাবিক মমতাগুণে বাধ্য হয়ে গর্ভধারণ, প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং তাকে লালনপালন ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার জন্যে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করেন। একটি অবুঝ অবস্থায় শিশুকে বুদ্ধিমান ও সক্ষম মানুষে পরিণত করার পেছনে একটি মায়ের কত যে সাধনা, পরিশ্রম, ধৈর্য, ও সংকল্পের মনোভাব জাগিয়ে দেন এবং মায়েদের দুঃখ কষ্ট আর ধৈর্যসাপেক্ষ দীর্ঘ সংগ্রামের গুরুত্বের স্বীকৃতি এবং মর্যাদাও দেন তিনিই। পবিত্র কোরানের আয়াতেই এ বাস্তবতাই যথার্থভাবে চিত্রিত হয়েছে। যখন আল্লাহ বলেছেন—

> "এবং বাস্তব কথা এই যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্যে নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে ধারণ করেছে এবং দু-বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এ-জন্যে আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।—আমরাই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।"
>
> (লোকমান-১৪)

মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির উপকারিতা

মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির উপকারিতার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষের মধ্যে আনুগত্য ও সেবাপরায়ণতার গুণ। এর বিভিন্ন দিক নিয়ে

আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এতে করে আমরা তার উপকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি যা মানবজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যেকার স্নেহভক্তির সম্পর্ক এবং সেবা ও আনুগত্যের সনাতন ঐতিহ্য অবক্ষয়মান দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা এই অভিশপ্ত পরিণতির কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো যে, যদি আজকের মানবতা প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সেবা ও আনুগত্যের বৃহত্তম আবেগ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে মানুষ হিসাবে তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। এই মানুষরাই যখন অতি সামান্য এক মাংস-পিন্ডের মতো অসহায় ও গুরুত্বহীন ছিল তখন মাতা-পিতা কিভাবে তাদের সাথে দয়া-নম্রতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদের অতি সামান্য দুঃখ কষ্টেও তাঁরা অস্থির বিচলিত হয়ে উঠেছেন এবং নিজেরা শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে হলেও তাদেরকে সঠিকভাবে সুখে ও নিরাপদে রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ সেই মাংস-পিন্ডের মতো অক্ষম অসহায় শিশুরা যখন সবল ও সক্ষমতা অর্জন করে বড় হয়েছে তখন পিতামাতার সেই মহান অবদানের কথা যেন একদম ভুলে গেছে। তারা আজ পিতামাতার আনুগত্য ও সেবার দায়িত্বকে উপেক্ষা করে দারুন অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। এখন অকৃতজ্ঞ মানুষ আজ মাতাপিতার খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজনকে পর্যন্ত অস্বীকার করছে। বস্তুতঃ এ-ধরনের অকৃতজ্ঞ মানুষকে মানুষ বলাই ভুল। এরা বিবেকহীন হয়ে নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করেছে।

আমরা দেখতে পাই যে মাতাপিতার অবাধ্যতাসহ সবরকমের নোংরামী এবং নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন সত্বেও এমন অনেক জাতি ও দেশ রয়েছে যারা বৈষয়িক দিক থেকে বিস্ময়কর উন্নতি অর্জন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি পারস্পরিক ভালবাসা, সহানুভূতি, আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং যাদের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার বা নিস্বার্থ সেবার কোন আবেগ উদ্দীপনা থাকে-না,—তারা বাহ্যিক যত উন্নতিই করুক না কেন-মানুষ হিসেবে কি তাদের কোন

গুরুত্ব আছে ? নির্জীব জীবন্ত লাশের মতো ঐসব যান্ত্রিক লোকগুলোর কি আছে কোনও মান মর্যাদা ? যে সমাজে টাকাটাই আসল কথা, সেখানে স্বার্থপর তাই ব্যক্তির মৌলিক গুণ; যেখানে মানুষ অন্য মানুষের অধিকার আর মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, সেখানে সেই সমাজকে যান্ত্রিক বলা যেতে পারে সত্য কিন্তু মানব সমাজ বলা যেতে পারে না। কারণ সেখানে পবিত্রতা ও মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। সত্যিকারের কোন মানুষ এই যান্ত্রিক সমাজে স্বস্তিতে থাকতে পারে না।

আমরা আমাদের যুগ ও সমাজের যতই পর্যালোচনা করি ততই ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ইসলামী শিক্ষার প্রভাব আমাদের সামনে উজ্জ্বল রয়েছে। এই ইসলামের মাধ্যমেই আমরা এই সত্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি যে—মায়ের পদতলেই সন্তানের বেহেশত্।

এ-থেকে শুধু এটা অনুধাবন করা উচিৎ হবে না যে ইসলাম মাতাপিতার সেবা ও অনুগত্যের উপকারিতা বলতে শুধু তার নৈতিক উপদেশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি পর্যন্তই সীমিত রাখে না, বরং তাকে আল্লার ইবাদাতেরই একটি অংশ হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের কাজেকর্মে বাস্তবায়নের আদেশ দেয়।

এতে করে আমরা অনুমান করতে পারি যে মানব জীবনে ইবাদাতের সীমা কতো ব্যাপক, এই ইবাদাতের সীমায় সবরকমের ন্যায় ও সৎকর্ম শামিল থাকে যা মানুষ মহৎ উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকে। এতে করে কর্তা ছাড়া অন্য কারো তেমন কোন উপকার হয় না বরং ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের মাধ্যমে কর্তা নিজেই তার সেবা ও মহত্বের মাধ্যমে সমাজে নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে, তার মধ্যে এক নতুন ভদ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, যেন যাবতীয় অর্থহীন ও গুরুত্বহীন তৎপরতা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার সব কাজকর্ম মূল্য ও মর্যাদার দিক থেকে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে ; মোট কথা তার পুরো জীবনটা হয়ে উঠে অনন্য সুন্দর।

বলাবাহুল্য, মাতাপিতা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভরশীল। এসব বিধি-বিধান প্রাকৃতিক আইন-বিধির তাবে-

দাবী করে না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আদেশের সাথে সম্পৃক্ত। কর্মই তার পরিচয়। এদিকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। এসব কিছু মানুষের স্বাভাবিক আইন কানুনের অতীত এবং সার্বজনীন ব্যাপারে মানুষ বস্তুতঃ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে তখনই পূর্ণতা অর্জন করে এবং সত্যিকারের অর্থে মানব জীবন কল্যাণমুখী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠে যখন সে এসব বিধিবিধানের যথার্থ অনুসরণ করে।

কোন সন্দেহ নেই যে, যে সমাজে সততার সমাদর বৃদ্ধি পাবে, যেখানে মানুষ পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসবে, পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করবে। জনসাধারণের সৎকর্ম ইবাদাতের মধ্যে শামিল হবে এবং তাদের পুরো জীবনের উপর বাস্তব ও অদৃশ্যজগতের আধ্যাত্মিক আলো ছড়িয়ে থাকে—তখন এধরনের সমাজ স্বাভাবিকভাবে সবরকমের নোংরামী ও বেলাল্লাপনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এক একটি সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে, সমাজের প্রতিটি লোক নিরাপদ, সন্তুষ্ট ও সুখী জীবনের আমেজ অনুভূতি নিয়ে বাঁচবে। আর এটাই সত্যিকারের আদর্শ সমাজ বলে গণ্য হবে।

বিবাহ বিধি ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়নের শর্ত

পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা বিবাহবিধি এবং সন্তানসংক্রান্ত বিধির এই দীর্ঘ আলোচনায় কোথাও কোরানী শিক্ষা থেকে দূরে স'রে যাইনি। তা-সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমানযুগে এসব বিধিবিধানের বাস্তবায়ন ও তার উপকারিতার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না কেন ? আমরা যে চিত্র তুলে ধরেছি বাস্তবে তার কোন ছাপ দেখা যায় না কেন ? আমাদের কথা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণ কি ? এ সব প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। অথচ এটাও ঠিক যে, এসব বিধিবিধান থেকে উপকার অর্জনের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কোথাও উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ দেখা যায় না। বলুনতো, বীজ বপন না করে কি গাছ এবং তার ফলের আশা করা যায় ?

উল্লেখযোগ্য যে, আধ্যাত্মিক বিধি বিধান ও তার ফলাফল দেখানোর জন্যে কিছু শর্ত-শরীয়তের দাবী রাখে। যেভাবে স্বাভাবিক বিধিবিধান ও নিজ

কার্যকারীতার জন্যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রয়োজন বোধ করে। আমরা আগে যেমন বলেছি এই উভয় ধরনের বিধিবিধানও আধ্যাত্মিকতার গোত্রভুক্ত এ-জন্যে এসবের প্রভাব ও ফলাফল এবং উপকারিতা কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ও শর্তের নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে ঃ

নীচে আমরা এ ধরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

(১) প্রথম শর্ত এই যে, স্বামী স্ত্রীর মিলন শরীয়তের শর্ত ও নীতি মোতাবেক হবে। এরই মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাক পবিত্রতার সৃষ্টি হতে পারে। এটা অত্যন্ত মহৎচিন্তা যা বিবাহবিধি এবং সন্তান সংক্রান্ত বিধিকে বলিষ্ঠতর করে এবং তাতে কোনরকমের কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেয় না। কেন না, এই উভয় বিধিবিধানের উন্নতির আসল হেতু ব্যক্তির যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহত্বের অনুভূতি এবং এই মহত্বের অনুভূতি যেনা বা ব্যভিচার থেকে কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা, যে কোন ধরণের যৌন নোংরামী মানুষের বিবেকে নিরাপত্তা বোধ এবং আত্মমর্যাদার কোন অনুভূতি সৃষ্টি করে না। সুতরাং যদি কোন সমাজে যৌন নোংরামীর প্রচলন শুরু হয়ে থাকে এবং সেখানকার জনগণ যদি নোংরামীকে কোন রকমের আপত্তিকর কিছু মনে না করে তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, তাদের বিবেক সেই নোংরামীকে সমর্থন করছে অথবা তাকে কোন রকমের মানবিক মূল্যবোধ বলে গণ্য করছে বরং এ-ধরনের যৌন নোংরামীকে যে কোন সমাজের লোকই অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট পর্যায়ের অপরাধ বলে মনে করে। বিবাহবিধির বাস্তবায়নে এবং তার সম্প্রসারণে বিঘ্নতায় এধরনের পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এতে করে মানুষের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্যেই আমরা দেখতে পাই ব্যভিচারকারীও ব্যভিচারকারিনী অর্থাৎ অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনাকারীদের মধ্যে কখনো প্রেম-প্রীতি ভাল-বাসা-সহানুভূতি, দয়া ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি মহৎ আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। যেমন, বৈধ উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকারী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে।

বলা-বাহুল্য যেসব বিষয়াবলী বিবাহবিধীর পরিপন্থী তা সন্তানসংক্রান্ত বিধিরও পরিপন্থী। সুতরাং যে সন্তান অবৈধ যৌন সম্পর্ক বা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে—সেই অবৈধ সন্তানের জন্যে তার মায়ের মনে যথার্থ স্নেহ-মমত্বের অনুভূতি কক্ষণো সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তার মন নিরাপত্তা ও পবিত্রতার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল। ঠিক একইভাবে অবৈধ সন্তানের মনেও ব্যভিচারীনী মায়ের জন্যে সেই গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার মনোভাব জাগতে পারে না। অন্যদিকে একটি বৈধ সন্তান যেমন তার মাতাপিতার পূর্ণ স্নেহভালবাসা পায় তেমনি সেও যথার্থভাবে তার মাতাপিতাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

অবৈধ মা এবং অবৈধ সন্তানের মধ্যেও যে এক ধরণের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে তার বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করবো না। কিন্তু সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রকমের পবিত্রভাব বা শ্রদ্ধার অনুভূতি থাকতে পারেনা সে ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লার আনুগত্য ও শরীয়তের সীমায় থেকে যে পবিত্রতা, স্নেহ ভালবাসা ও সম্মানবোধ অর্জিত হতে পারে তা অন্য কোন ভাবে অর্জন করা যায় না। মাতৃত্বের পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধের উপরই সন্তান ও সমাজের পবিত্রতা ও মর্যাদা নির্ভরশীল। সুতরাং যে সমাজে মায়ের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত নয় সে সমাজে কোন রকমের মহৎ মানবিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব টিকে থাকা মুশকিল।

সতত: স্মরণযোগ্য যে, মহান আল্লার সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর পাঠানো জীবনধারণের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হচ্ছে বিবাহবিধী ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির ভিত্তি। সুতরাং যে ব্যক্তির মনপ্রাণ আর ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্যের বৈশিষ্ট থেকে বঞ্চিত, তারপক্ষে নিজ সন্তানদের মধ্যে আধাত্মিক গুণাবলীর সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

পবিত্র কোরানে হযরত ইমরাণের স্ত্রীর আদর্শকে একটি অনুসরণযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লার সাথে তার সম্পর্ক এমনই গভীর ও অকৃত্রিম ছিল যে তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকেও আল্লার সেবায় উৎসর্গ করেন।

তাঁর সেই গভীর আন্তরিকতার পবিত্রতম ফলশ্রুতি ছিল তার সেই কন্যা-সন্তান যিনি পরিণত বয়সে পেঁছে পুরো বিশ্বমানবতাকে সততা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। পবিত্র কোরানে ইমরাণের স্ত্রীর প্রার্থনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

> "আমার প্রভু! আমি এই শিশুকে,—যা আমার গর্ভস্থ রয়েছে তোমাকে উৎসর্গ করছি, যে তোমারই কাজের জন্যে উৎসর্গীকৃত থাকবে। আমার এই প্রস্তাবকে কবুল কর। তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।" (আলে ইমরাণ-৩৫)

এভাবে তিনি নিজেই নিজের অধিকার ত্যাগ করেন এবং আল্লার পথে উৎসর্গ করে দেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে দুনিয়ার আদর্শ সন্তানের মর্যাদা দান করেন। নিঃসন্দেহে এটা মাতৃত্বের এক অনন্য সুন্দর উদাহারণ।—এই আদর্শ সন্তান ছিলেন হযরত মরিয়ম (আঃ)। তাঁর সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে—

> "অবশেষে তার প্রতিপালক সেই মেয়েটিকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করেন এবং তাকে অত্যন্ত সতী মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলেন।" (আলে ইমরাণ-৩৭)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে গোটা দুনিয়াতে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং সেই ছেলে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-কে যেসব গুণাবলী দান করেন সে ব্যাপারে তিনিই বলেন—

> "এবং নিজ মায়ের অধিকার আদায়কারী বানিয়েছেন এবং আমাকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও কঠোর বানান নি।"
>
> (মরিয়ম-৩২)

তিনি আরো বলেন—

> "এবং আমাকে কল্যাণময় করেছেন—যেখানেই আমি থাকি এবং নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন—যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি।" (মরিয়ম-৩১)

আমরা জানি হযরত ঈসা (আঃ) আল্লার দেয়া গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে ইহুদী জড়বাদী এবং অন্যান্য বাতিল-শক্তির শিবিরে কি প্রচণ্ড প্রকম্পন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি দুনিয়ার মানুষের সামনে যে নৈতিক শিক্ষা দান করেছেন তা চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মতে এ বিষয়ের স্পষ্টিকরণের জন্যে এই উদাহরণটিই যথেষ্ট ছিল। এর পর অন্য কোন উদাহরণ পেশ করার আদৌ দরকার নেই।

(২) বিবাহবিধির কার্যকরী উপকার অর্জনের দ্বিতীয় শর্ত হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মজবুত সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছাড়া যথার্থ দাম্পত্য জীবনের কল্পনা করা যায় না। মানসিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস এবং মহত্ত্ব ও উদারতা দাম্পত্য সম্পর্কের অনিবার্য দাবী। তারা যে একজন অন্যজনের জন্যে অপরিহার্য এই অনুভূতিও তাদের থাকতে হবে।

আর সেই অনুভূতি অনেকটা এ রকমের হবে যে, স্বামী স্ত্রীকে শান্তি ও স্বস্তির উৎস মনে করবে এবং স্ত্রী স্বামীকে তার প্রেমিক ও দায়িত্বশীল মনে করবে। স্বামী মনে করবে যে স্বস্তি ও শান্তির জন্যে স্ত্রী হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, আর স্ত্রী এটা মনে করবে যে তার নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সহায়তার জন্যে পুরুষের প্রাধান্য খুবই জরুরী। উভয়ে উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক মনে করবে। স্ত্রী কখনো স্বামীর প্রয়োজন থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। সার্বিকভাবেই তার স্বামীর সহায়তা দরকার। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে নারী এক দুর্বল অস্তিত্ব। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসাব ও পালন এবং মাসিক ঋতু প্রভৃতি তার সামনে এক চিরন্তন ও স্বাভাবিক বিড়ম্বনা। এজন্যে সব সময় তার একজন মজবুত অবলম্বনের দরকার। নারীর এই দাবী ও চাহিদা কেবল তার স্বামীর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে। এজন্যে সে পুরুষের পক্ষ থেকে কোন রকমের নির্লিপ্ত উদাসীনতা বা অবহেলাকে কক্ষণো সহ্য করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের এই বুনিয়াদ যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাদের পারস্পরিক আস্থা ও প্রতিশ্রুতি যদি ভঙ্গ হয়ে যায়, যদি তাদের আন্তরিক ভালবাসা ও পবিত্র মহানুভবতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়—তাহলে বুঝতে হবে

যে দাম্পত্যের মূল উদ্দেশ্যই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এর পর গুণ ও বৈশিষ্ট ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু যৌন সম্ভোগ আর বৈষয়িক স্বার্থের সংকীর্ণতায় সীমিত হয়ে পড়ে। এভাবে তারা মৌলিক মানবিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এরপর তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, দয়া, ভালবাসা ও ত্যাগতিতিক্ষার কোন মহৎ গুণই অবশিষ্ট থাকে না।

এ ধরনের সম্পর্ককে অবশ্য আমরা ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্তও করতে পারিনে। কারণ, ব্যভিচারীদের মধ্যে কোন রকমের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকে না। অন্যদিকে স্বামী ও স্ত্রী দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে কিন্তু ইসলামের নির্দ্ধারিত নীতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক অনেকটা বিড়ম্বিত হয়ে পড়ে।

বিষয়টিকে উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বলা যেতে পারে—,যেমন স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই আয় উপার্জন করে এবং দিনভর পরিশ্রম করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে, তাদের চেষ্টা-সাধনা আর সংগ্রাম শুধু বেশী টাকা আয় করে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন পর্যন্ত সীমিত থাকে। ঝকঝকে চকচকে মোটরগাড়ী প্রাচুর্যময় ঘরবাড়ী আর দামী পোষাক পরিচ্ছদ ও দামী বিলাসিতার সামগ্রী অর্জনই হয় তাদের এতো সব ব্যস্ত-তৎপরতার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনবোধে তারা জীবনের বাজী লাগাতেও প্রস্তুত। বলাবাহুল্য এধরনের মানসিকতায় আক্রান্ত স্বামী-স্ত্রীর ঘরে প্রকৃত সুখ-শান্তি ও প্রেম প্রীতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য। তাদের জীবন স্বার্থের সংকীর্ণ গন্ডিতে সীমিত হয়ে শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠে এবং তারা এক নির্জীব নিস্পৃহতার শিকারে পরিণত হয়। যেহেতু স্ত্রী স্বামীর মতোই আয়-উপার্জন করে সেহেতু স্বামীর প্রতি তার মনে বিশেষ কোন শ্রদ্ধা বা গুরুত্বের ইমেজ অবশিষ্ট থাকে না এবং স্বামীও নিজেকে স্ত্রীর সামনে বড় অর্থহীন জীব মনে করে। এভাবে তাদের পারিবারিক জীবনে যে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয় তাতে করে দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মূল বুনিয়াদটাই ধ্বসে পড়ে যা তারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আজকের আধুনিক সমাজে দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কের যে দারুণ অধঃপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ মূলতঃ এটাই।

বস্তুত ঃ পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে স্ত্রী অর্থাৎ মহিলাদের উপর। স্ত্রী বা মহিলারাই হচ্ছে পারিবারিক সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এখন যদি সেই স্ত্রী বা মহিলারাই তাদের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে হেস্তনেস্ত হতে থাকে তাহলে সারাদিনের অস্বাভাবিক খাটুনির পর তারা ঘরে ফিরে আর কি দায়িত্ব পালন করবে?

পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অক্ষুন্ন রক্ষার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে নারীর উপরে পুরুষের দায়িত্বশীলতা। এখন যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমভাবে আর্থিক আয়-উপার্জন করে অর্থাৎ স্ত্রীও স্বামীর মতো মেহনত-মজুরী করে আয়ের মাধ্যমে পারিবারের ব্যয় নির্বাহ করে তাহলে উপার্জনকারী হিসেবে স্বামীর যে গুরুত্ব ছিল তা বহাল থাকবে কোন যুক্তিতে?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এখানে আমরা মহিলাদের চাকরী করার বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা করছি না। আমরা এখানে কেবল অবস্থা ও পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনাই তুলে ধরছি যা বিবাহবিধির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্যে সহায়ক হতে পারে এবং সে সব কারণও তুলে ধরছি যার পরিণতিতে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব ও পারিবারিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে। রইলো নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যের কথা! তা সে সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোচনা করার অবকাশই কোথায়?

এই যে আজকের এসব জটিল সমস্যাবলী এর জন্যে কেবল নারীকেই দায়ী করা চলে না বরং পুরুষরা নারীদের চেয়েও বেশী অপরাধী। পুরুষ তার স্ত্রীর অর্থউপার্জনের তৎপরতাকে শুধু যে শীতল মনে সহ্য করে তা নয় বরং স্ত্রীর উপার্জনে আর্থিক উন্নতি ঘটছে বলে আত্মতুষ্টিও অনুভব করে। কিন্তু মামুলি কয়েকটা টাকার জন্যে তার দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি ধ্বসে পড়ছে সেদিকে সে দেখে ও না দেখার ভান করে। আজ পুরুষ যে নারীর শান্তি ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে সেজন্যে পুরুষের বৈষয়িক লালসাই প্রধানতঃ দায়ী। আর এমন লোভী ও স্বার্থপর কাপুরুষেরা নারীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে যে অসমর্থ ও অযোগ্য তাতে সন্দেহ কি? এসব কারণেই আজ দাম্পত্য সম্পর্ক ও পারিবারিক

জীবনে অভিশপ্ত পরিণতি ডেকে এনেছে। যে জীবন মহৎ মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত এবং শুধু অর্থ ও স্বার্থের গোলামে পরিণত হয়ে রয়েছে তাদের ভাগ্যে এই পরিণতিই স্বাভাবিক। তারা কোন দিনই প্রকৃত সুখ-শান্তি-স্বস্তি ও সন্তুষ্টি পেতে পারে না। এরা ধনে-সম্পদে যত উন্নতিই করুকনা কেন মানুষের মর্যাদা পাবে না কোনদিন।

নিঃসন্দেহে এসব কারণেই ইসলামের নির্ধারিত বিবাহবিধির সেসব সুফল অর্জিত হচ্ছে না যা অর্জিত হবারই কথা। ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এসব অদূরদর্শী তৎপরতার কারণেই আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক এতোটা ঠুনকো ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, একান্ত মামুলি মতবিরোধও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে পড়ে।

এর পর এতে করে যে মায়ের মমতার উপর কতো বিরাট প্রতিকূল প্রভাব পড়ে তা সহজেই অনুমান করা চলে। যে মহিলা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে কলে-কারখানায়-অফিসে-আদালতে গলদঘর্ম হয় তার স্বাভাবিক অনুভূতি ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। এধরনের মহিলারা নম্রতা-মিষ্টতা, লজ্জাশীলতা ও নারীসুলভ কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তারা তখন নিজেদের আয়-উপার্জনের জন্যে গর্বিতা হয়ে পড়ে এবং আরো অধিক উপার্জনের নেশায় মরিয়া হয়ে উঠে। তাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব নির্জীব-নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং কোনরকমের নৈতিক-চারিত্রিক বা ইসলামী শিক্ষা তাদের আর আকর্ষণ করে না। এভাবে তারা মাতৃত্বের মহান ও মহৎ গুণাবলীকে নিজেরাই বর্জন করে। এরপর তাদের মধ্যে সততা ও পবিত্রতার ভাবমূর্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে— সেতো স্বাভাবিক কথা।

স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল যৌন ক্রিয়ার সক্ষমতার নামই বিয়ে নয়। এবং কোন মহিলা কেবল সন্তান উৎপাদন আর তার লালন-পালন করেই নারীত্বের মহান মর্যাদা পেতে পারে না। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী আদর্শের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচন করেছি যার অধীনে একটি পুরুষ ও একটি নারী পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বন্ধন আসলে একটি নারী ও পুরুষের মধ্যেকার মিলন সেতু। এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ এতই মহান ও তাৎপর্যময় যে নিছক জড়বাদী

দৃষ্টিকোন থেকে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে যে সুফল দেখা দেয় তাকে এক কথায় সদয় ভালবাসা বলা যায়। মা ও সন্তান-সক্রান্ত ব্যাপারটিও ঠিক একই পর্যায়ের। মায়ের মমতা অর্থ সন্তান প্রসব আর দুধ খাওয়ানোই নয় বরং মায়ের মমতা হচেছ একটি নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মা তার সন্তানের মধ্যে এমন অনির্বাণ আলোর স্ফুরণ ঘটায় যা গোটা সমাজ তথা বিশ্বমানবতাকে সুপথ দেখায়।

ইসলামের শিক্ষা ও উদ্দেশ্যকে এই ব্যাপকপ্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝার চেষ্টা করতে হবে। ইসলাম এভাবেই তার পারিবারিক নীতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজীবনের সর্বত্র এমন এক সর্বাত্মক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা সমাজ প্রচলিত যাবতীয় বৈষয়িক বিড়ম্বনা ও কু-প্রথাকে ঝেটিয়ে দূর করে এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও শান্তির বুনিয়াদের উপর সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর মূল শক্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে তার আধ্যাত্মিক রোশনি।

উল্লেখিত বাস্তবতার আলোকে এটা আমরা ভাল করেই অনুমান করতে পারি যে, বিবাহ সংক্রান্ত এবং মা ও সন্তান সংক্রান্ত ইসলামিক বিধিবিধানের কার্যকরী সুফল অর্জিত না হওয়ার কারণ কি? বিবাহ ব্যবস্থা থেকে আধ্যাত্মিকতার বিলুপ্ত ঘটলো কেন? এবং মাতাপিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও আনুগত্যের সহানুভূতিই বা বিনষ্ট হলো কেন?

(৩) বিবাহবিধির কার্য্যকরী সুফল অর্জনের তৃতীয় শর্ত হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পবিত্রতা আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে এবং তাদের সম্পর্ক বৈষয়িক স্বার্থপরতার উর্দ্ধে থাকবে। মোট কথা, বিয়ে-শাদীর উদ্দেশ্য এমন এক আধ্যাত্মিক ফল অর্জন করা যা পার্থিব কোন উপায়ে লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন বলেছি, নিছক সন্তান উৎপাদনই বিয়ের উদ্দেশ্য নয় বরং বিয়ে হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নাম যার মাধ্যমে একটি নারী পূত-পবিত্র এক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং আল্লাহর ইবাদতের পর এর গুরুত্বই সব চেয়ে বেশী। কেন না, এই বিয়েই মানব সম্পর্কীয় ধারাবাহিকতায় এমন এক সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করে যা মানব অস্তিত্বকে পাক-পবিত্র এবং তার বিবেককে করে সজীব-সুন্দর।

কক্ষণো না; আল্লাহ আপনাকে কক্ষণো অপমানিত করবেন না কেন না আপনিতো দয়ালু ব্যক্তি। দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের আপনি আতিথ্য করেন; যারা ক্লান্ত তাদের বোঝা তুলে নেন, দরিদ্রদের জন্যে আয়-উপার্জন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লোকদের সাহায্য করেন।

এভাবে আমরা আরো দেখতে পাই যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের কঠিন মুহূর্তগুলোতে প্রিয়নবী (সঃ) কখনো কখনো চিন্তিত বা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন তখন এই হযরত খাদীজাই (রা) প্রিয়নবীকে সাহস যোগাতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন। এসব কারণেই, হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালে প্রিয়নবী (স) এতোটা দুঃখিত হন যে ইতিহাসে সেই বছরটি "দুঃখের বছর" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

প্রিয়নবী ও হযরত খাদীজার মধ্যে যে গভীর ভালবাসা ছিল তা ছিল অন্যন্য অনবদ্য। প্রিয়নবী (স) কক্ষনো হযরত খাদীজার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। গভীর আন্তরিকতা ও সীমাহীন ভালবাসার আবেগ সহকারে তিনি হযরত খাদীজাকে স্মরণ করতেন। হযরত খাদীজার প্রতি প্রিয়নবীর এই গভীর ভালবাসা দেখে তাঁর কোন কোন স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন "কি ভাগ্যসেই স্ত্রী যাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর মহান স্বামী তাঁর প্রশংসা করেন।"

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তাতে আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে বিবাহবিধি এবং মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধিবিধানের বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় মানবিক, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক শর্ত ও ব্যবস্থাবলীর দিকে ইঙ্গিত করেছি—যা এসব ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে এবং এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক মজবুত ও স্থিতিশীল করা।

প্রসঙ্গতঃ আমরা আবার বলবো যে, সেই উভয় বিধিবিধানের বাস্তবায়নে যদি বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ না করা হয় তাহলে তাথেকে কক্ষণো কাংখিত সুফল অর্জিত হবে না। ফলে তা বাগানের সেই ফুলগাছগুলোর মতো হবে যা রোপনের পর মালিকে আর স্পর্শই পায়নি এবং উপযুক্ত দেখাশুনার অভাবে

তা শুকিয়ে গেছে। গাছগুলোকে সজীব ও সতেজ রেখে ফুল উৎপাদনের ন্যূন্যতম শর্ত ও বিধানগুলো মানা হয়নি বলে—ফুল উৎপাদনতো দূরের কথা—গাছটিকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

উদাহারণস্বরূপ মনে করুন,—ওসব বিধিবিধানকে কার্যকরী করার জন্যে যে জিনিষটির দিকে প্রথম দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো আল্লার অধিকার। এরপর সেসব উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ যে সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এটা হচ্ছে উল্লেখিত বিধিবিধান বাস্তবায়নের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। আর এর নিকৃষ্টতম পদ্ধতি হচ্ছে ব্যভিচার অথবা নারীর এমন চাকরী-বাকরী যাতে সে পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে বাধ্য হয় সন্তানদের লালন-পালন এবং স্বামীর সেবাযত্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পিতামাতার সাথে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক ও সন্তোষজনকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পিতা- মাতার জন্যে তাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সেই পবিত্র আবেগ অনুভূতিরও সৃষ্টি হয় না যা শরীয়ত সৃষ্টি করাতে চায়।

এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা যখন আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক দাম্পত্য জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামী নীতি এবং বিধিবিধানের সন্ধান ও পর্যালোচনা করি তখন তার সহজ-সুন্দর ও বাস্তবানুগ শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে আমরা শুদ্ধচিত্তে আল্লার প্রশংসা করতে বাধ্য হই। দেখুন একটি ছোট্ট আয়াতে আল্লাহ আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র কতো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> "তোমাদের নারীরা তোমাদের ক্ষেতের মতো; তোমাদের স্বাধীনতা আছে যেভাবে চাও নিজের ক্ষেতে যাও। কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা করো এবং আল্লার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচ। খুব ভাল করে জেনে রেখো যে একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। (এবং হে নবী যারা তোমার হেদায়েত মেনে নিয়েছে) তাদেরকে (কল্যাণ ও সৌভাগ্যের) সুখবর দিয়ে দাও।" (বাকারা—২২৩)

মায়ের অধিকার

ইসলাম মানুষকে ভালবাসা, দয়া আনুগত্য এবং ভদ্রতা ও নম্র ব্যবহার শিখায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে এসব মহৎ গুণের পরিচয় দিতে বলে। ইসলামের সব আদেশ-নিষেধ ও ব্যবস্থায় এবং সবরকমের পরামর্শ ও উপদেশ মানুষকে এসব মহৎ গুণাবলী অবলম্বনের তাকিদ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরান ও হাদীসে মা, মায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা কোন কোন জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে, আবার কোন কোন জায়গায় মাতাপিতার কথা একইসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সব জায়গাতেই মাতাপিতার অকৃত্রিম, স্থায়ী ও শর্তহীন ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতাপিতার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশী এবং মাতাপিতার সেবাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালবাসার এই অনুভূতি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ইসলামের উদ্দেশ্য, বিশেষ করে প্রতিটি সন্তানের মনে এই পবিত্র ও মহৎ অনুভূতির স্থায়ী প্রকাশ দেখতে চায়। কারণ এই পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্ব আসলে মাতাপিতারই মহান অবদান। এখানে সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে পিতার শ্রম সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষা আর মায়ের স্নেহ মমতা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার অবকাশ আমাদের নেই। মা ও পিতার এসব স্নেহ-দয়ার কথা বাদ দিলেও সন্তানের অস্তিত্বটাই মাতাপিতার পক্ষ থেকে এমন এক অবদান যার সত্যতা অস্বীকার করার সাধ্য কারো থাকতে পারে না।

মানুষের ঠুনকো অস্তিত্বটা আসলে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ নয়। এসব খাওয়া-পরার আয়োজন ফ্যাশন বিলাসিতা সব কিছুই একান্তই অর্থ-হীন ব্যাপার। মানুষের মানবিক মূল্য ও গুরুত্ব তখনিই হবে যখন সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার চারপাশের পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আল্লার অসংখ্য নিদর্শনাবলীকে দেখে আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার আদেশের সামনে মাথা নত করে

দেবে। ঐই বিশেষ জ্ঞান ও উপলব্ধিই মানুষকে অন্যান্য জীব ও প্রাণী থেকে সতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করে। মানুষ এই আসল জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে মহাপ্রকৃতির পর্যবেক্ষন করে, চিন্তা ভাবনা করে এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। এরই মাধ্যমে সে পায় আত্মার সজীবতা। এই পর্যায়ে পেঁছেই মানুষ পৃথিবীর সবরকম দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি অর্জন করে এবং এই পৃথিবীর জীবনেই সে বেহেস্তের সুখ-শান্তি পবিত্রতা ও কল্যাণময়তার অধিকারী হয়ে উঠে। জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্মের এই মঞ্জিলে পেঁছে মানুষ তার অমরতা অর্জন করে। এমতাবস্থায় আল্লার আনুগত্যের মোকাবেলায় দুনিয়ার শক্তি ও সম্পদকেই তার কাছে একান্ত তুচ্ছ মনে হয়। এই হচ্ছে সেই পরম কাম্য আধ্যাত্মিক মান যা একজন সত্যিকারের মুমেনমুসলমান আল্লার ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।

আর যে ব্যক্তি এই মহান নেয়ামতের একটি সামান্যতম অংশও পেয়ে যায় তাহলে তার জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত মনে করতে হবে। আর এই যে সৌভাগ্য মানুষ অর্জন করার সুযোগ পায় তার জন্যে সে প্রকৃতপক্ষে মাতাপিতার কাছেই ঋণী থাকে। মাতাপিতার মাধ্যমেই তো সে এই জীবন এবং জীবনের পরম স্বার্থকতা অর্জন করে থাকে। এই জন্যেই আল্লাহ মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার, তাঁদের সেবা করার এবং তাঁদের অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরানের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—

> "হে নবী! ওদের বল যে, 'এস, আমি তোমাদের শোনাবো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর কি বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।" (আনআম— ১৫১)

আরেকটি আয়াত হচ্ছে—

> "এবং তোমরা সবাই আল্লার দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।"
>
> (নিসা—৩৬)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তার প্রতি শোকর আদায়ের সাথে সাথে মাতাপিতার শোকর আদায় করারও নির্দেশ দিচ্ছেন—

> " এবং এটা সত্য কথা যে আমরা মানুষকে নিজ মাতাপিতার অধিকার জানার জন্যে নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্টের উপর কষ্ট স্বীকার করে তাকে নিজের পেটে রেখেছে এবং দু-বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এই জন্যেই আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর কর এবং নিজ মাতাপিতার শোকর আদায় কর। আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।" (লোকমান—১৪)

উপরের আয়াত সমূহের ব্যাপারে চিন্তা করলে দুটি বাস্তবতা স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় —

এক—এই যে, আল্লার পক্ষ থেকে মাতাপিতার সম্মান করার নির্দেশ দেয়া এবং তাও আল্লার পরস্পরই মাতাপিতার সম্মান করার আদেশ এই কথাই প্রমান করে যে ইসলামের দৃষ্টিতে মাতাপিতা উভয়ই একই রকম মান-মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত।

দুই—এই যে, তাঁদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদের সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকা এবং তাঁদের ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং তাঁদের নিষেধকে সিগ্‌গীরই পালন করা সন্তান মাত্রেরই ফরজ। (অবশ্য তাঁরা যদি ইসলাম বিরোধী কোন হুকুম দেন তাহলে তা মানা সন্তানের জন্য বৈধ নয়।)

উপরে বর্ণিত দুটি অধিকারের ক্ষেত্রে মা এবং বাপ উভয়ের স্থান সমান। এ ক্ষেত্রে উভয়ই সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী। তবে দুটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে মা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারিনী।

প্রথম স্থান

গর্ভধারণ ও দুধ খাওয়ানো এমন দুটি সতন্ত্র দায়িত্ব যা কেবল মায়ের উপরই বর্তায়। পবিত্র কোরানেও মায়ের এই দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দুটি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাকে যে কতো দুঃখ কষ্ট ও ধৈর্য সাধনার পরীক্ষা দিতে হয় তা সবারই জানা কথা। এই জন্যে মায়ের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অধিকার খুবই যুক্তি সঙ্গত।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন—

"তার মা কষ্টের পর কষ্ট উঠিয়ে তাকে পেটে ধারণ করেছে" এর অর্থ হচ্ছে এই যে আল্লার নির্ধারিত কলাকৌশল মোতাবেক মা সন্তানের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত হয়। আর "দু'বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে" এর অর্থ হলো মা কেবল তার অস্তিত্বের মাধ্যমই হয়নি বরং তার করেন তার জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানও হয়েছে। আর এই দুটি বৈশিষ্টের সমন্বয়ে মা অত্যন্ত উচ্চতর ও বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছে সুতরাং মায়ের সেবা আল্লার ইবাদতের মতো হয়ে যায়। এই জন্যেই প্রিয় নবী (স) মায়ের সেবাকে ইবাদাতেরই অন্যতম রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। (সর্বসম্মত)

এভাবে, মায়ের অবদান শুধু জন্মদান পর্যন্তই সীমিত নয় বরং তার চেয়ে আগিয়ে মা সন্তানদের লালন-পালন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানও করেন। এই জন্যে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক যার উল্লেখ আমরা ইমাম রাযীর কথায় করেছি।

দ্বিতীয় স্থান—

তাঁর দ্বিতীয় মর্যাদা এই যে, সন্তান সংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়ন তার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ ব্যপারে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করছি। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে, এটি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নাম যা কেবল মায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এরই মাধ্যমে আল্লাহ সন্তানের স্বভাবে সেই গুণাবলীর সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সে মাতাপিতার অধিকার জানতে পারে এবং তার মনে মাতাপিতার জন্যে শ্রদ্ধার অনুভূতি ও চেতনা জাগে।

মনে করুন ভবিষ্যতে কোন সময় যদি প্রজনন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা পুরুষের শুক্রানু এবং নারীর ডিম্বানুর সংমিশ্রনে কৃত্রিম উপায়ে কিছু তৈরী করতে

সক্ষমও হয়ে যায় তাহলে তা দেখতে শুনতে জীবন্ত মতো দেখালেও প্রকৃত পক্ষে তার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সত্তার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ থাকবে। কোন শিশু এই গুন মায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এজন্যে মানব শিশুকে মায়ের পেট থেকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আসাটা একটি প্রাকৃতিক শর্ত। এ ছাড়া মানব শিশুর মধ্যে সেই মানবিক গুণাবলির বিকাশ কক্ষনো হবে না যার উল্লেখ কোরানে করা হয়েছে।

মায়ের আরেকটি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা হচ্ছে —তিনি সন্তানের মধ্য বিবেচনা ও অনুভূতি শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে থাকেন। এটা আল্লার এক অনন্য দান। এই কারণেও মায়ের মর্যাদা বাপের তুলনায় অনেক বেশী।

সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে সন্তানের উপর মায়ের অধিকার বাপের তুলনায় তিনগুন বেশী। এর প্রমান হিসাবে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের সেই সহীহ হাদীসটি উল্লেখযোগ্য, যাতে বলা হয়েছে।

> "এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর (সঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো হে আল্লার রাসূল! আমাদের সাথে অবস্থানকারিদের মধ্যে কে আমাদের উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি উপযুক্ত?" প্রিয়নবী (স) বললেন 'তোমাদের মা।' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, প্রিয়নবী (সঃ) আবার একই জবাব দিলেন—"তোমার মা।" এর পর লোকটি জিজ্ঞেস করলে প্রিয়নবী (স) বললেন—"তোমাদের পিতা।"

এই জন্যে হাদীস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, বাপের তুলনায় মায়ের অধিকার তিনগুন বেশী।

উল্লেখযোগ্য যে আমরা এখানে মায়ের সেই সব অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছিনা যা আদায় করা প্রত্যেক সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। যেমন মায়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, তাঁর ব্যয়ভার বহন করা, সেবা করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা মায়ের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারেরই কথাই বলছি। নয়তো মায়ের সাধারণ অধিকার এবং মর্যাদা যে কতো বেশি তা প্রিয়নবীর হাদিস থেকেই প্রমানিত হয়ে যায়—

> "একবার এক ব্যক্তি প্রিয়নবী (স) দরবারে এসে বললো ওগো আল্লার রাসূল (স)। আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করিতে চাই কিন্তু আমি তার উপযুক্ত নই। প্রিয়নবী জিজ্ঞেস করলেন —তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেহ জীবিত আছেন কি। লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ আমার মা জীবিত আছেন।" প্রিয়নবী (স) বললেন যাও, অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে মায়ের খেদমদ কর। যদি তুমি এমন কর তাহলে তুমি হজ্জ ওমরাএবং জিহাদ তিনটির পূণ্য পাবে।" (তাবরানী)

এরই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি হাদিস ইবনে মাজা, নাসাই এবং হাফেয প্রামান্য দলীলের সাথে বর্ণনা করেছেন—

> "একব্যক্তি প্রিয়নবীর (সঃ) দরবারে এসে বললো "ওগো আল্লার রাসূল। আমি জিহাদে অংশ নিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে উপস্থিত হয়েছি। প্রিয়নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মা কি বর্তমান আছেন।" লোকটি জবাব দিল—"হ্যাঁ"। প্রিয়নবী (স) বললেন — তাঁর সাথেই থাক এবং তাঁর সেবা কর, কেন না বেহেশত তাঁর চরণতলেই রয়েছে।" (হাদীস)

প্রিয়নবীর (সঃ) এসব বাণীর মাধ্যমে মায়ের উচ্চতর মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। এভাবে ইসলাম মায়ের মর্যাদা ও সেবায় মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে. ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও মায়ের এমন উচ্চতর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পর্দা

উপস্থাপনা

পর্দা শব্দটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বয়ং মুসলমানদের জন্যেইঅপরিচিত এবং অস্পষ্টবোধক ছিল। অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্দার বিভিন্ন অর্থ বের করা হয়। সুতরাং অনেক লোক বিভ্রান্তিবশতঃ পর্দার অর্থ বলতে নারীকে অন্ধকার ঘরে বসিয়ে রাখাকে বুঝিয়েছে যেখান থেকে নারী যেন কোথাও আসতে বা যেতে না পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে বিয়ের পর মেয়েরা শুধু নিজের পিতৃগৃহ ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত করতে পারতো না এবং স্বামীর গৃহ থেকেই শেষ বারের মত তার জানাযা বের হতো। এটাকে তারা তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের প্রতীক মনে করতো এবং এটা ছিল তাদের কাছে বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয়। এ ধরনের বিদঘুটে অবস্থায় নারী যদি কোন মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়তো তাহলে এমন কি ডাক্তারকেও রুগীনীকে দেখার অনুমতি দেয়া হতোনা। কেবল মেয়ের পিতা, ভাই এবং শ্বশুর তাকে দেখার সুযোগ পেতো। এছাড়া রুগীনীকে কেউ দেখতেও পেতোনা তা কেউ ডাক্তার হোক বা কোন নিকটাত্মীয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি কিছুটা কম ছিল। সেক্ষেত্রে মেয়ে নিকটাত্মীয়দের বাড়ী যাতায়াত করতে পারতো। তবে এই আসা যাওয়ার অনুমতি ছিল শুধু রাতের বেলায় কারণ তখন তার উপর পর পুরুষের দৃষ্টি পড়ার আশংকা ছিল তুলনামূলক ভাবে কম। আর ধনী পরিবারের মেয়েরা পালকি বা পশু চালিত যানবাহনে যাতায়াত করতো। কিন্তু এসব পালকি ও যানবাহ-

নের দরজা জানালা খুব ভাল করে বন্ধ রাখা হতো। যদি দরজা জানালা না থাকতো তাহলে পুরো পালকি বা বাহনটিকে কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো

যাইহোক, পদব্রজে হোক বা যানবাহনে উভয় অবস্থাতেই নারীকে কড়া পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা মেনে চলতে হতো। কাপড়ের উপর আরো কাপড় ঢেলে তার পুরো অস্তিত্বটাকে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হতো যে আপাদমস্তক শরীরের সব কিছুই পুরু পর্দার অন্তরালে হারিয়ে যেতো এবং পর্দাটা এতোই লম্বা হতো যে তার একটি অংশ মাটিতেই লুটোপুটি খেতো। এই কঠোর পর্দাব্যবস্থা আজো কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। পর্দার এই স্বপ্রবর্তিত ব্যবস্থা শহরের ও গ্রামের ধনী ও অভিজাত লোকদের একটি ফ্যাশনে পরিণত ছিল।

সুতরাং বিখ্যাত আধুনিকতাবাদী কাশেম আমীন বেগের মতো লোকেরা যখন নারী স্বাধীনতার পতাকা তোলেন তখন সমাজে প্রচলিত এ ধরনের কঠোর পর্দা ব্যবস্থারই সমালোচনা করে একে ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থি বলে ঘোষনা করেন এবং এও বলেন যে এটা ইসলামের নির্দেশিত মানবিক সাম্যের বিরোধী, কারণ এতে করে নারীর ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। এসব যুক্তির বুনিয়াদের উপর তাঁরা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবি সমাজকে নিজেদের পক্ষে দলভুক্ত করেন।

উম্মুল মোমেনিনদের পর্দা

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে পুরো কোরান শরীফে পর্দা সম্পর্কে একটি মাত্র আয়াত রয়েছে। আর এ আয়াত উম্মুলমোমেনীন অর্থাৎ প্রিয়নবীর (সঃ) স্ত্রীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর পটভূমিতে রয়েছে সেই বিখ্যাত ঘটনা যা কোরানের ব্যাখ্যাকাররা তাঁদের তফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছেন। কোরানের পর্দা সংক্রান্ত সেই আয়াতটি হচ্ছে—

> "হে ঈমানদারগন! নবীর গৃহসমূহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, খাবার সময়ও উঁকি দিওনা। তবে হ্যাঁ, তোমাদেরকে যদি খেতে ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই আসবে, যখন খাবার খেয়ে নেবে তখন চলে

যাবে, কথাবার্তায় লেগে থেকো না। তোমাদের এসব ব্যবহার নবীকে দুঃখ দেয় কিন্তু তিনি লজ্জার কারণে কিছু বলেন না, আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চেয়ে নিও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য উত্তম পন্থা। তোমাদের জন্য এটা কক্ষনো বৈধ নয় যে আল্লার রাসূলকে দুঃখ দেবে। এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদের সাথে বিয়ে করাও বৈধ নয়। এটা আল্লার কাছে বিরাট পাপ। তোমরা কোন কথা প্রকাশ কর বা গোপন কর —আল্লাহ সব কথাই জানেন"। (আহযাব—৫৩)

এই আয়াতকেই পর্দার আয়াত বলা হয়। এই আয়াত অবতরণের অনেক আগেই শুধু ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোন অনুধাবনের আলোকেই এবং আল্লার ওহির সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে হযরত উমর উম্মুল মোমেনীনদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুতরাং হযরত উমর একাধিকবার প্রিয়নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করেন যে, "ওগো আল্লার রাসূল (স) আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন যে তাঁরা যেন পর্দা করেন। কিন্তু যেহেতু আইন প্রনয়ণের ব্যাপারে তিনি স্বাধীন ছিলেন না। তাই তিনি এ ব্যাপারে আল্লার আদেশের অপেক্ষা করেন। বোখারী মুসলিমে হযরত আনাস বিন মালেকের বর্ণনা মওজুদ রয়েছে। তাতে রয়েছে হযরত উমর প্রিয়নবীর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন —

ওগো আল্লার রাসূল (স) আপনার কাছে ভালমন্দ সব রকমের লোক আসে। হয়তো ভাল হবে, যদি আপনি আপনার পাক পবিত্র স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিয়ে দেন।" সুতরাং এই পর্দার আয়াত নাজিল হয়। এবং এর অবতরণ সেই প্রাতকালে হয় যেদিন প্রিয়নবী হযরত যয়নব বিনতে জাহেদকে বিয়ে করেন।

শুধু তাই নয়। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক হযরত উমর এর অভিমত ছিল— এই পর্দা সে রকমের হবে যে, কেহ যেমন তাঁদের গৃহে যাবে না তেমনি তাঁরা নিজেরাও ঘর থেকে বেরুবেন না। এমনকি কেউ যেন তাঁদের দেখতে না পায়।

হাদিসের বর্ণনায় আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে উম্মুল মো'মেনিন হযরত সাওদাহ বিনতে জময়া (রাঃ) এক রাতে নিজের কোন প্রয়োজনে পর্দা সহকারে বাইরে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত উমরের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে। যেহেতু তিনি দির্ঘাকৃতির ছিলেন এজন্যে হযরত উমর তাঁকে চিনে নেন এবং বলেন;

"খোদার শপথ হে সাওদা (রা) আপনি আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকোতে পারেন না। দেখেই চেনা যায় সুতরাং আপনি বাহিরে বের হবেন না।" একথা শুনে হযরত সওদা (রা) প্রিয়নবীর (স) কাছে উপস্থিত হন এবং পুরো ঘটনা খুলে বলেন—প্রিয়নবী (স) তখন হযরত আয়েশার গৃহে নৈশভোজ গ্রহণ করছিলেন। একথা শুনে প্রিয়নবী এলহামী অবস্থায় পড়েন এবং বলেন—"

> "তোমাদের জন্যে এই অনুমতি রয়েছে যে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বেরুতে পার।"

(এই ঘটনা, ইমাম বোখারীর সহীহ হাদীস এবং তফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন তাবারী ইবনে কাসীর এবং কুরতবীতে দেখা যেতে পারে। প্রামানা দলিলের জন্যে ওসব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।)

হাফেয ইবনে হাবার ফতহুল বারীতে লিখেছেন—"পর্দার আয়াত অবতরণের পর হযরত উমর এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন যে পর্দাবৃতা কোন মহিলার ব্যক্তিত্ব যেন চেনা না যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ী করেন। তাঁকে এ ধরণের বাড়াবাড়ী করতে বারণ করে দেয়া হয় এবং উম্মুল মো'মেনিনদেরকে নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বেরুবার অনুমতি দেয়া হয় যেন তাঁরা কোন অসুবিধায় না পড়েন।"

উপরের বিস্তারিত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উম্মুল মো'মেনিনদের জন্য যে ধরণের পর্দা ফরয করা হয়েছিল তা তাদের মুখমন্ডল এবং হাতের পর্দা ছিল। তা তাঁদের পর্দাবৃত ব্যক্তিত্বের পর্দা ছিল না।

বিখ্যাত ফকীহ কাজী আয়াম এ প্রসঙ্গে বলেন--"এ ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, উম্মুল মো'মোমিনদের উপর যে ধরনের

পর্দা করা ফরয করা হয়েছিল তাতে মুখমন্ডল ও হাত শামিল রয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রেও এসব খোলা রাখার অনুমতি ছিল না— তা স্বাস্থ্যের ব্যাপারই হোক বা অন্য কিছু।"

এরই দেখাদেখি অভিজাত মহলের মহিলারাও নিজেদের জন্যেও সেই ধরনের পর্দা বেছে নেন যা আল্লাহ্ উম্মুল মোমেনিনদের জন্যে পসন্দ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম ব্যবহার অনুসরণ করা। অতএব, প্রিয়নবী (সঃ) আমল থেকেই তার অনুসরণ চলছে। কিন্তু পরবর্তি যুগে পর্দার ব্যাপারে আরো অতিরিক্ত বিধিনিষেধ ও বাড়াবাড়ীর সমন্বয় ঘটে — যেমন আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এভাবে পর্দার নামে কঠোর প্রথা সমাজে প্রচলিত হতে শুরু করে এবং একশ্রেণীর লোক এটাকে তাদের পারিবারিক আভিজত্যের অংশে পরিনত করে নেয়। এভাবে তারা পর্দার ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকেই খর্ব করে। তাদের পর্দাটা ইসলামী না হয়ে একটা প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। (সুতরাং কেউ বিয়ের পয়গাম দিয়েও নিজের হবু স্ত্রীকে দেখার অনুমতি পায় না। অথচ শরীয়তে তার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানের দিকে তাদের দৃষ্টি কি থাকবে তারা তো সামাজিক প্রচলন নিয়েই বেশী মাথা ঘামায়।)

মুসলিম নারীর পর্দা

পর্দা মুসলিম নারীর সেই স্বতন্ত্র ভূষণ যা ইসলাম তার জন্যে নির্দ্ধারিত করেছে। ইসলাম পর্দার মাধ্যমে অন্ধকার যুগের অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনী প্রথার মুলোচ্ছেদ করেছে এবং পর্দাহীন সমাজে সৃষ্ট যাবতীয় বেলেল্লাপনা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করে দেয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এখানে ইসলামের বৃহৎ উদ্দেশ্য প্রমানিত করার জন্যে এবং ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব কার্যকরী করার জন্যে অন্ধকার যুগের কিছু ঘটনার উল্লেখ করা উচিৎ ছিল—যা থেকে এটা বুঝা যেতো যে ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করে নারী জাতিকে কি দারুণ বিপর্যয় ও দুরবস্থা থেকে রক্ষা করেছে। এতে করে সে সব লোকদের মুখোশও উম্মোচিত হয়ে পড়তো যাঁরা নারীকে

কেবল পাশবিক উল্লাসের সম্বল বলে মনে করে। কিন্তু সেসব ঘৃন্য জঘন্য যৌন নোংরামীর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকা-দের পবিত্র মনকে তমসাচ্ছন্ন করিতে চাইনা।

তবে অন্ধকার যুগের সামাজিক পরিবেশের একটা চিত্র তুলে ধরার জন্যে পবিত্র কোরানে যে সব প্রয়োজনীয় আয়াত বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করার পরামর্শ আমরা অবশ্যই দেবো। পবিত্র কোরানের এসব আয়াতে অন্ধকার যুগের বিভিন্ন বদ অভ্যাস, কুসংস্কার ও অশ্লীলতার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছেএবং তাদের মধ্যে প্রচলিত নোংরামীর জন্যে তাদের তিরস্কার ও ভৎসনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এমন সব আইনবিধিও প্রনয়ন করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন করে ঐসব অপরাধ প্রবনতা, নোংরামী ও অশ্লীলতা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে।

এসব আয়াত অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে যে অন্ধকার যুগে নারীর অবস্থা কতো বেদনাদায়ক ছিল এবং ইসলাম কিভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে নারী ছিল শোষিতা, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা। ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে এনে আসন দিয়েছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষাদীক্ষায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি আধ্যাত্মিকভাবেও উচ্চতর মর্যাদা দান করেছে। আগে যেখানে নারীকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতেও সবাই অপ্রস্তুত ছিল, সেখানে ইসলামই শুধু তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ঘোষনা করেছে এবং তাকে সেবা করা ও শ্রদ্ধা করাকে আল্লার ইবাদাতের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছে।

নীচে আমরা ইসলামের এমন কিছু বিশেষ মূলনীতির উল্লেখ করবো যা সামষ্টিক ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে যে-কোন সমাজের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

(১) সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইসলামের সব বিধিবিধানে নারী পুরুষ উভয়কে একই গুরুত্ব দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে। কোরানে একদিকে যেমন বলা হয়েছে যে—

> "হে নবী ! মুমিন নারীদের বলুন যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি নীচে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে ।"

সেখানে সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে—

> "হে নবী ! মুমিন পুরুষদের বলুন যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি নীচে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে ।"

বলাবহুল্য পবিত্র কোরানে নারী-পুরুষ উভয়কে একই বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে আহবান জানানো হয়েছে ।

(২)ইসলাম, মন মগজের পরিচ্ছন্নতা মানুষের আভ্যন্তরীন অবস্থার গঠন, এবং সামাজিক পরিবেশকে অশ্লীলতা ও অপরাধ প্রবনতার যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করতে চায় । কারণ যাবতীয় পাপ, অপরাধ ও নোংরামীর উৎস মানুষের মন্দ কাজের সাথে সম্পৃক্ত । এক্ষেত্রে ইসলাম নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোন থেকে দেখে না । কারণ নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । সুতরাং পবিত্র কোরানে উভয়েরই সংশোধনের আইন জারী হয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন—

وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب * ذلكم
أطهر لقلوبكم وقلوبهن *

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ের পরিশোধন করা । সুতরাং আয়াতের পরবর্তী বাক্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য মনুষের হৃদয়কে সবরকমের কলুষতা থেকে মুক্ত রাখা এবং হৃদয়কে পুতঃ পবিত্র করে তোলা । ইমাম এই কোরানী বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—

"- - - - - - - এর অর্থ এই যে চোখের মাধ্যমে পাপের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং দৃষ্টির উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্যে করা হয়েছে যে হৃদয়ের আবেগকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে চোখ অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। পুরুষ হোক বা নারী —উভয়ই অতি সহজে ও অতি শিগগীর দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সব সময় নীচের দিকে দৃষ্টি রাখবে—উপরে তাকাবেই না! না তা নয়। যদি তাই হতো তাহলে এটা ভীষণ কষ্টকর হতো, কারণ মানুষ সমাজে থাকে, তাকে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে হয়। এখন যদি সবসময় "নিচের দিকেই চেয়ে হাটতে হয় তাহলে নানারকম অসুবিধের সম্ভাবনা থাকে। তাই ইসলামের এই কথা যে "নিচের দিকে দৃষ্টি রেখো" তার আসল অর্থ হচ্ছে মনকে সেসব চিন্তা ও বাসনা থেকে মুক্ত রাখ যাতে মন কলুষ ভাবনায় জড়িয়ে পড়তে পারে। পবিত্র কোরান মু'মিন পুরুষ ও নারীকে এই শিক্ষা দেয় যে তারা যেন তাদের মন মেজাজকে ভ্রান্ত বিষয়াবলিতে জড়িত না করে এমন সব কল্যাণমূলক কাজে মনোযোগ দেয় যাতে সমাজের উপকার ও উন্নতি হয়। তারা যেন এমন সব বিষয়াবলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে যাতে জীবনের উন্নত ও মহত্তম মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যেন নিজেকে নিজে চিনতে ও জানতে পারে। এসব বিষয় মানুষের সাহস ও উদ্যোম বাড়ায়, চিন্তাকে সুদূর প্রসারী করে, এবং হীন ও তুচ্ছ তৎপরতা থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখে।

এসব আবেগ অনুভূতি নিয়ে ব্যক্তি যখন তার পরিবেশের দিকে তাকায় তখন তরুণ তার মনে সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে এরপর সে তুচ্ছ ব্যাপার সমূহের দিকে আকর্ষণ বোধ করে না। যেমন হঠাৎ কোন সুন্দরী রূপসি নারীর দিকে চোখ পড়লেও তার মনমেজাজে কোনরকম মন্দ ভাব জাগে না, সে তার দৃষ্টি ও চিন্তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেন কোন ব্যাপারটা কিছুই নয় এবং সে দেখা মাত্রই তার দৃষ্টিকে অন্যত্র ফিরিয়ে নেয়। একই অবস্থা একজন মো'মেনা নারীরও।

(৩) তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলাম মানুষকে সৎ, পূতঃ-পবিত্র, নম্র ও ভদ্র করে গড়ে তোলে। অন্ধকার যুগে নরনারী যেমন অসংখ্য রকমের পাপাচার, কুপ্রথা ও কুকর্মে অভ্যস্থ ছিল তেমনি নৈতিক ও চারিত্রিকভাবেও

তারা ছিল দেউলিয়া। সেই সমাজের নারী পুরুষ অবাধে অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতো।

অন্ধকার যুগের অসংখ্য কুপ্রথার মধ্যে একটি ছিল নারীদের সৌন্দর্য ও দেহ প্রদর্শনীর প্রথা। তারা পথ চলতে গিয়ে রূপের প্রদর্শনী করতো, কখনো চপলা, কখনো চঞ্চলা, কখনো থমকে থমকে, কখনো থেকে থেকে বিভিন্ন রকমের কসরৎ ও অভিনয় করে পথ চলতো। আর এভাবে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তারা লোকদের ব্যাভিচারের জন্যে উস্কাতো।

ইসলাম অন্ধকার যুগের এই কুপ্রথা ও অশ্লীলতাকে উচ্ছেদ করে ঘোষণা করে যে—

> "বর্বর যুগের রূপচর্চা ও দেহপ্রদর্শনী করে ঘোরাফেরা করো না।"
> (আহযাব-৪)

অর্থাৎ তাদের আদেশ দেয়া হলো যে, ইসলাম আবির্ভাবের আগে যেভাবে তোমরা রূপচর্চা ও প্রদর্শনীর যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাও। প্রথমতঃ তোমরা বিনা দরকারে ঘর থেকেই বের হয়ো না। আর যদি দরকারবশতঃ বেরুতেই হয় তাহলে এভাবে বের হবে যেন মর্যাদা ও শালীনতা ক্ষুন্ন না হয়। আর তার উপায় হচ্ছে এই যে তোমরা নিজেদের উপর চাদর ঢেকে পর্দা কর যেন মনে হয় যে তোমরা পাকপবিত্র এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা। যেমন আল্লাহ বলেছেন—

> "হে নবী! নিজের স্ত্রীদের এবং মেয়েদের এবং মুসলমান নারীদের বলে দাও যে, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের ঘোমটা টেনে দেয়।' এই ব্যবস্থায় একথা অধিকতর প্রত্যাশাযোগ্য যে তাদের বিরক্ত করা হবে না।" (আহযাব -৫৯)

উল্লেখযোগ্য যে, চাদর এবং ঘোমটা টানার অর্থ এই হবে যে, নারীর সব গোপন অংগ তাতে ঢাকা পড়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর আকরামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে-এর অর্থ হচেছ এমন চাদর যা তার মাথা, চুল এবং অন্যান্য অংগকে ঢেকে নেয়।

অন্ধকার যুগে আরেক নোংরামীর উল্লেখ করে ইবনে কাসীর বলেন— "রাত্রিকালে শহরের গুন্ডা প্রকৃতির লোকেরা বিভিন্নস্থানে ওৎ পেতে বসে থাকতো এবং যাতায়াত কারিনী নারীদের উত্যাক্ত করতো। কিন্তু কোন মহিলা যদি পর্দায় থাকতো তাহলে তাকে কোন রকমের বিরক্ত না করে নিরাপদে চলে যেতে দিতো।"

উপরের আয়াতের পরই এই নীচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এতে অসৎ লোকদের কঠোর সতর্কবাণী উচ্চরণ করে বলা হয় যে তারা যদি তাদের মন্দ কার্যকলাপ পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ বলেন—

> "যদি মুনাফেকরা এবং ওসব লোকেরা যাদের মনে মন্দপ্রবণতা রয়েছে এবং ওরা যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে নিজেদের কার্য্য কলাপ থেকে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তোমাদের দাঁড় করিয়ে দেবো, এর পর তারা এই শহরে খুব করেই তোমাদের সাথে অবস্থান করতে পারবে। তাদের উপর সব দিক থেকে অভিশাপের বৃষ্টি পড়বে, যেখানেই যাবে ধরা পড়বে এবং শোচনীয়ভাবে মারা পড়বে।
>
> (আহযাব—৬০- ৬১)

এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা উভয় শ্রেণীর অপরাধের মান একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং তাদের জন্যে একই রকম শাস্তি নির্দ্ধারণ করেছেন। সাধারণতঃ নারীদের সাথে নোংরা ব্যবহারকারীদের অপরাধ রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের অপরাধের তুলনায় অনেক হাল্কা মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় ধরনের অপরাধ একই শাস্তির আওতায় পড়ে এবং দুটি অপরাধই সমানভাবে জঘন্য। এক ধরণের লোক রাজনৈতিক বিশৃংখলার মাধ্যমে দেশ ও সরকারের ক্ষতি করলে অন্য ধরণের লোকেরা তার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের গোড়ায় কুঠারাঘাত হানে।

এভাবে ইসলাম পুরো বিশ্বমানবতাকে অসৎ ও অশ্লীল কার্যকলাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম মানবতাকে শরীয়তের আইনের অনুযায়ী হবার আমন্ত্রণ জানায় যা নারীর শালীনতা ও সম্মান সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম সমাজকে গুন্ডা-বদমাশদের নোংরা তৎপরতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে অত্যন্ত বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। এভাবে পুরো মানবতাপূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও পবিত্রতার সাথে নিরাপদে বাঁচার সুযোগ পাবে।

(৭)—চতুর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষকে সেই স্বাভাবিক বিধির নিরিখে সৃষ্টি করেছেন তারা যেন তারই আলোকে জীবন যাপন করে। অর্থাৎ পুরুষ তার নির্দ্ধারিত কর্মক্ষেত্র ও সীমা লংঘন করবে না। পুরুষের জন্যে নারীর বেশ ধরার কোন বৈধতা নেই। পুরুষ ঠিক পুরুষের মতো থাকবে আর নারী ঠিক নারীসুলভ স্বাভাবিকতা নিয়ে থাকবে। কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ করবে না।"

সহীহ হাদীসে ইবনে আব্বাস একটি হাদীস এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

> "আল্লার রাসূল, নারীর বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।" (হাদীস)

অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন—

> "আল্লার রাসূল, নারীদের মতো পোষাক পরিধানকারী পুরুষদের উপর এবং পুরুষদের মতো পোষাক পরিধানকারিণী নারীদের উপর অভিশম্পাত করেছেন।"

নারী ও পুরুষদের বেশধারণকারীদের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকেই বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করে থাকে। এধরনের নরনারীকে ঘৃণা করে। কেননা এতে করে একদিকে যেমন নারী ও পুরুষ উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব হয় তেমনি তাতে করে যৌন উত্তেজনা ও সৃষ্টি হয়ে থাকে যা দর্শকমাত্রকেই উত্তেজিত করে। এই জন্যে যে কোন রুচিবান ভদ্রলোক নারী পুরুষের ছদ্মবেশকে ঘৃণার চোখে দেখেন। ইসলাম যে এটাকে ঘৃণার চোখে দেখে তার আরো একটি কারন আছে।

তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার প্রকৃতিগত বৈপরিত্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। কারণ আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিষই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কেন যে তিনি সব জিনিষ জোড়ায় জোড়ায় বানিয়েছেন তা আমরা বুঝে না থাকলেও এর পেছনে যে আল্লার মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাছাড়া নর নারীর সৃষ্টি মহাপ্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং তারা পরস্পরের কাছে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এখন নারী পুরুষের পরস্পর পরস্পরের বেশভূষা অবলম্বন করার মাধ্যমে শুধু যে তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব হয় শুধু তাই নয় আসলে এতে করে প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধাচরণও করা হয়। এতে করে আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লংঘনের বিরাট অপরাধ হয়। এ দিক থেকে তা ঘৃন্য ও নিন্দনীয় ব্যাপার।

স্মরণ রাখা দরকার যে মানবতা হচ্ছে এক ব্যাপকভিত্তিক আইন বিধিরই নাম, বরং মানবতার অর্থ হচ্ছে এক সর্বব্যাপী বিধিবিধানেরই বাস্তব রূপ। এখন যদি কেউ মানুষ হয়ে ও মানবিক আইনবিধি লংঘন করে তাহলে বুঝতে হবে যে সে নিজেই তার স্বাভাবিক ব্যবহার বিরুদ্ধাচারণ করছে। আসলে এমন ব্যক্তি তার বিবেক বুদ্ধির দেউলিয়েপনারই প্রমাণ পেশ করে--তার মানবিক জ্ঞানশক্তি যে লোপ পেয়েছে সে তারই সাক্ষ্য পেশ করে। এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব জীবনের আসল পথ থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাদের আসল স্বভাবের পথে পরিচালিত করতে চায় এবং তাদেরকে জীবনের সত্যিকার অর্থ খুজে বের করার আমন্ত্রণ জানায়। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রতিটি নর ও নারীকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুধাবনের জন্যে উৎসাহিত করে। পুরুষের বেশধারী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষদের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তারা জীবনের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে রেহাই পেতে চায়—যা নর বা নারী হিসেবে তাদের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পলায়নপরতার এই আগ্রহই স্বাভাবিক আইনের বাস্তবায়নকে ব্যাহত করে। একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠন ও তার উন্নয়নের

ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। বলাবাহুল্য, ইসলাম এধরনের যাবতীয় ক্ষতিকর প্রবনতা ও কর্মকলাপের সব উপায় ও মাধ্যমের বিলুপ্তসাধনে বদ্ধ-পরিকর যা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে।

(৫) ইসলামের বিবেচনায় নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘরবাড়ী। এটা নারীর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এর সাথে বিদ্রোহ করার অর্থ হচেছ তার নিজের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথেই বিদ্রোহ করা। নয় বা নারী যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি মোতাবেক কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা সমাজ সঠিকভাবে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করবে।

নারীর স্বভাবের দাবী হচেছ সে ঘরবাড়ীর সীমানায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। এর অন্যথা কাজ করলে অর্থাৎ তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। এই জন্যেই আল্লাহ প্রিয়নবীর স্ত্রী, মেয়ে এবং মুসলিম নারীদেরকে নিজেদের মান মর্যাদার সাথে ঘরবাড়ীতে অব-স্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘরবাড়ীতে শান্তি ও সম্মানের সাথে অবস্থান করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কর। বস্তুতঃ এটাই তোমাদের স্বভাব সম্মত পন্থা। এর বিরুদ্ধাচারণ করলে ক্ষতি অনিবার্য।

কোন অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের সামনাসামনি হওয়া কোন-ক্রমেই উচিৎ নয়। আর অপরিহার্য প্রয়োজনের কোন সীমা কোরান নির্ধারন করেনি। এ ব্যাপারে বিবেচনার ভার মানুষের বিবেকের উপরই বর্তাবে। কারণ বিবেকই সবচেয়ে উত্তম বিবেচক।

এভাবে নারী তার অর্থনৈতিক, শিক্ষা অথবা কোন দ্বীনি প্রয়োজনে ও বাইরে বেরুতে পারে। যেমন হযরত সাওদাহ (রা) এর ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনীয় ব্যাপারে প্রিয়নবী নারীদের বাইরে বেরুবার অনুমতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর তার তাফসীরে আরো বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন—

"আত্মমর্যাদার সাথে নারীদের নিজ নিজ গৃহে অবস্থানের" অর্থ হচেছ নিজেদের গৃহেই অবস্থান কর এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরিও

না। আর দ্বীনি প্রয়োজনের মধ্যে নামাজের জন্যে মসজিদে আসাটাও শামিল রয়েছে।

যদি কোন প্রয়োজনে বা ঘটনাচক্রে পরপুরুষের সামনাসামনি হয়ে পড়তে হয় তাহলেও কিছু আসে যায় না, তবে পরপুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় শরীয়তের সে সব আদেশ নিষেধ ও শর্ত শরীয়তের দিকে লক্ষ করতে হবে যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি আমরা এখানে তুলে ধরছি।

উম্মুল মো'মেনিন এর অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে জানা যায় যে, মদীনার পথে এবং হজ্জ আদায়ের সময় কেন কোন সাহাবাদের সাথে তারা সামনাসামনি হয়ে পড়তেন। এতে কোন রকমের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। তবে এ ধরণের অবস্থায় দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।—

(১)—এধরণের সামনাসামনি সাক্ষাৎ যেন নির্জন একাকীতে না হয়। এধরণের সামনাসামনি অবস্থা ঘরে বা বাইরেও হতে পারে। এব্যাপারে কোন শর্ত নেই কিন্তু এধরণের সাক্ষাতের সময় স্বামী বা বাপ-ভাই এ ধরনের মুহাররমদের মধ্যে কেউ সাথে থাকা খুবই জরুরী। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য।
প্রিয়নবী বলেছেন—

> "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে সে কোন নারীর সাথে একাকীত্বে (যেন) কক্ষনো সাক্ষাৎ না করে ; তবে হ্যাঁ, যদি তার সাথে মহররমদের মধ্যে কেউ থাকে।"

বোখারী শরীফের অন্য একটি হাদিস হচ্ছে

> "কেউ কোন নারীর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করবে না ; অবশ্য যদি তার কোন মুহাররম থাকে।"

(উল্লেখযোগ্য যে মুহাররম হচ্ছে শরীয়তের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে নারীর সে সব নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে করা তার জন্যে নিষিদ্ধ বা হারাম' যেমন বাপ-ভাই, চাচা মামা ইত্যাদি)

তবে হাদীসের অর্থ বা উদ্দেশ্য এই নয় যে ইসলাম পুরুষ বা নারীর উপর কোন আস্থা পোষণ করে না। না তা নয়। আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য পথকেও বন্ধ করে দেয়া। এই জন্যই পর পুরুষ ও পর নারীর মধ্যে একাকীত্বে সাক্ষাৎকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিনা অনুমতিতে কাউকে কারো ঘরে প্রবেশ থেকে বারন করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম আরো কিছু নিষেধ আরোপ করে বিশৃংখলা ও বিপদের সব সম্ভাব্য পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। নর-নারীর বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষন ছাড়া এর কোন উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং প্রিয়নবী এই উদ্দেশ্যই পর নারী ও পর পুরুষকে পরস্পর একাকীত্বে দেখা সাক্ষাৎকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। প্রিয়নবী বলেছেন—

> "সাবধান! নারীদের কাছে একাকীত্বে যেয়ো না। কসম সেই পবিত্র সত্তার যার অধিকারে রয়েছে আমার প্রাণ; কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করে না--অবশ্য এই যে তাদের দুজনের মাঝ-খানে একজন শয়তান থাকে।"

কিন্তু যদি একাকীত্ব না হয় বা একাকীত্ব হলেও নারীর সাথে তার কোন মুহা-ররম থেকে থাকে তাহলে এধরনের সাক্ষাতে কোন আপত্ত নাই।

(২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, নারী তার রূপের প্রকাশ বা দেহ প্রদর্শনী বর্জন করবে। সে শরীয়তের নির্দ্ধারিত সীমায় থাকবে। সেই সীমা কি? তা নীচের আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে—

> "এবং নিজের রূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করো না, সেই রূপ সৌন্দর্য্য ছাড়া যা স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যায়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম করতুবী বলেন রূপসৌন্দর্য্য দুধরনের রয়েছে। একটি হচ্ছে স্বাভাবিক এবং অন্যটি কৃত্রিম। স্বাভাবিক রূপসৌন্দর্য্য বলতে আমাদের অর্থ হচ্ছে সেই রূপসৌন্দর্য্য যা তাকে প্রকৃতিই দান করেছে। আর কৃত্রিম রূপসৌন্দর্য্য হচ্ছে তা, যা নারী তার স্বাভাবিক রূপসৌন্দর্য্যের পরিস্ফুটনের জন্যে সাজ গোজ করে থাকে। যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, প্রসাধনী ইত্যাদি। (করতুবী দ্বাদশ খণ্ড-২৯ পৃষ্ঠা)

উপরের আয়াতে বর্ণিত "যা স্বয়ং প্রকাশ হয়ে পড়ে।" তার অর্থ হচ্ছে রূপ-সৌন্দর্য্য দুধরনের হয়ে থাকে। একটি যা প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং অন্যটি

গোপনীয় থাকে। প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন অভিমতের উল্লেখ করেছেন। যেমন কাতাদাহর মতে প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের অর্থ হচ্ছে কাঁকন, আংটি, সুরমা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়নবীর এই হাদীসটির ও উল্লেখ করেন। প্রিয়নবী বলেছেন—

> "কোন নারীর জন্যে, যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের বিশ্বাস রাখে, এটা বৈধ নয় যে সে তার নিজের হাত দুটিকে অর্দ্ধেকের উপর খোলা রাখে।"

এভাবে হযরত আয়েশা (রা) এর মতে প্রকাশ্য রূপ সৌন্দর্যের অর্থ কাঁকন-আংটি ইত্যাদি। এর সমর্থনে তিনি এই ঘটনাভিত্তিক হাদীসের উল্লেখ করেন যে, "একবার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁদের ওখানে এলো। সেই সময় প্রিয়নবীও সেখানে পৌঁছোন। প্রিয়নবী তাকে দেখে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নেন। এ দেখে হযরত আয়েশা বলেন—

> "ওগো আল্লার রাসূল (এটাতো আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী।" একথা শুনে প্রিয়নবী বললেন—"যখন মেয়ে সাবালিকা হয় তখন তার চেহারাও হাতের তালু ছাড়া কোন জিনিষ খোলা রাখা উচিৎ নয়।"

এরপর আরো একটি অভিমতের উল্লেখ করেন। অন্যান্য অভিমতের তুলনায় এটাই বেশী প্রামান্য ও যথার্থ বলে মনে হয়। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের অর্থ হল চেহারাও হাতের তালুর সাথে ওসব অলংকারও যা সাধারণত এই দুটি অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন আংটি, কাঁকন, প্রসাধনী ইত্যাদি।

যেমন আমরা আগেই বলেছি, এই অভিমতটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, নামাজ আদায়ের সময় লোকদেরকে "সতর ঢেকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নারীদেরকে সারা শরীরের শুধু মুখমন্ডল এবং হাতের তালু খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক মহিলাদের হাতের কুনুই পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে এসব মহিলাদের স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি তা হতো তাহলে এসব অঙ্গকে নামাজের সময়

খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হতো না। এই অনুমতিকে সামনে রেখে আল্লার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।"

(তাবারী, অষ্টাদশ খন্ড ১৪ পৃঃ)

করতুবী, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ এবং মাসুদ বিন আকরামার উদ্ধৃতি দিয়ে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এবং তা এই যে, প্রকাশ্য রূপ-সৌন্দর্যের অর্থ সুরমা, কাঁকন, অর্দ্ধেক হাতের প্রসাধনী, বালি, আংটি ও অন্যান্য অলংকার। মণীষীদের মতে এসব জিনিষ প্রকাশ্য রূপ সৌন্দর্যের পরিপন্থী নয়। (করতুবী দ্বাদশ খন্ড ২২ পৃষ্ঠা)

রূপসৌন্দর্যের অন্য আরেক প্রকার হচ্ছে গোপনীয়। এর মধ্যে হাঁসলী, বাজুবন্দ, পায়েল, মাথা ও বাহুর অলংকার ইত্যাদির প্রদর্শনী বৈধ নয়। এ ব্যাপারে পাক-কোরানের এই আয়াতে স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছে--

> "এবং নিজের রূপসৌন্দর্যকে প্রকাশ করোনা, ঐ রূপসৌন্দর্য ছাড়া যা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারা নিজেদের বক্ষের উপর নিজেদের চাদরকে বগলদাবা করে নেবে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না, অবশ্য ওসব লোকদের সামনে (যেমন) স্বামী, পিতা, শ্বশুর ছেলে, সৎছেলে, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, আপন নারী, নিজ গোলাম সে সব পুরুষ সেবক যারা নারীদের ব্যাপারে কোন উদ্দেশ্য রাখে না, অথবা ওসব ছেলে যারা এখনো নারীদের পর্দার ব্যাপারে অবহিত নয়, (এবং তাদেরকে আবেদন দাও যে) তারা চলার সময় নিজেদের পা মাটির উপর এভাবে না ফেলে, যে রূপসজ্জা তারা লুকিয়ে রেখেছে (শব্দের মাধ্যমে) তার প্রকাশ ঘটে।" (নুর -৩১)

করতুবী, প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্য্য ও রূপসৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন-- "রূপসৌন্দর্য্য কোনটা প্রকাশ্য হয় এবং কোনটা গোপনীয়। প্রকাশ্য রূপ-সৌন্দর্য্য দেখা মুহররমও অপরিচিত প্রত্যেকের জন্যেই বৈধ কিন্তু গোপনীয়

রূপসৌন্দর্য শুধু তারাই দেখার অনুমতি পাবে যাদের সম্পর্কে আল্লার কোরআনে বলা হয়েছে।

এই ছিল পর্দা সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরী কথা যা আমরা কোরান ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করেছি। এ ধরনের পর্দার ব্যবস্থা করা নারী ও পুরুষ সবার জন্যেই জরুরী। এর অনুসরণ করে মন মেজাজের পবিত্রতা অর্জন করা যেতে পারে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা কোন অর্থেই বৈধ নয়। কারণ এছাড়া অন্য সব পথই ক্ষতিকর এবং তাতে করে বিভিন্ন ধরণের নোংরামী ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট

পর্দা সংক্রান্ত এই দীর্ঘ আলোচনার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামের নির্দেশিত পর্দা ব্যবস্থা নিছক কোন প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি নয় বরং এটা হচ্ছে একটি যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি হচ্ছে এক ধরণের স্থবিরতা। তাতে কোন রকমের রদবদলের অবকাশ থাকেনা। কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনবোধে রদবদলের অবকাশ থাকে। জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের দাবি মোতাবেক তা কোন সময় কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হয় আবার কোন সময় কিছুটা শিথিলতাও দেখানো যেতে পারে। এটার অনুসরণ অন্ধ ও বধিরদের মতো হয়না বরং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মতো হয়ে থাকে। যেহেতু এটা একটি জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা তাই এর অনুসরণের জন্যে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োজন অপরিহার্য।

এতক্ষণ আমরা পর্দা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পেশ করেছি। এবার আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করবো।

(১) ঘর সংসারের মর্যাদা।
(২) নারীর রূপলাবণ্য ও প্রসাধন।
(৩) নারী পুরুষের সম্মিলন।

ঘরসংসারের মর্যাদা

ইসলাম তার অনুসারীদের ঘর সংসারের প্রতি মনোযোগ ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে আদেশ দেয়। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম এম্ন সব আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছে যা ঘর ও পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ শান্তি নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ করে। নীচে আমরা এসব আইনকানুন তুলে ধরছি।

(১) ইসলামী সমাজের কোন সদস্যের জন্যে ঘর ও পরিবারের বিভিন্ন ঘটনাবলী জানার জন্যে গোয়েন্দাগিরী করা অথবা উঁকিঝুঁকি করা সম্পূর্ণ

অবৈধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক চারিত্রিক অপরাধ। এই হাদীসটি থেকে এই অপরাধের জঘন্যতা প্রমাণিত হয়। প্রিয়নবী বলেছেন—

> "যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের অনুমতি ছাড়া তোমাদের ঘরে উঁকি মারে এবং তোমরা যদি তার চোখে কাঁকর মার যাতে সে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে (এর জন্যে) তোমাদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।
> (বোখারী, মুসলিম)

এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তখন দরজা খোলা ছিল। প্রিয়নবী বললেন—

> "যাও আলাদা সরে দাঁড়াও; চোখে চোখে অনুমতি নেয়া হয় না।
> (আবুদাউদ)

এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর পদ্ধতি ছিল তিনি যখন কারো ঘরে যেতেন তখন দরজার ডানে বা বামে সরে দাঁড়াতেন এবং তিনবার আসসালামু আলাইকুম বলতেন।

(২) তিনটি সময় এমন রয়েছে যখন ঘরের সেবক সেবিকাদের বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি ঘরের ছেলে-মেয়েদেরকেও ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি নিতে হয়। আর অনুমতি তখনই দেয়া যাবে যখন অনুমতিদাতা নিজে পর্দা করে থাকে এবং আত্মমর্যাদাবান হয়ে থাকে। উল্লেখিত তিনটি বিষয় হচেছ---

(ক) ফযরের নামাজের আগে, কেননা ফযরের পরে ঘুমানো উচিৎ নয়।
(খ) জোহরের সময় যখন মানুষ নিরিবিলি আরাম করতে চায়।
(গ) এশার নামাজের পরে যখন ব্যক্তি ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়।

পবিত্র কোরানেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে---

> "হে ঈমানদাররা! তোমাদের দাসী গোলাম এবং তোমাদের সেসব ছেলে যারা এখনো বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে, ফজরের নামাজে আগে এবং জোহরের সময়

যখন তোমরা পরিধেয় খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদের জন্যে পর্দার সময়। এর পরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের উপর এবং তাদের উপর কোন পাপ হবেনা। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নিজের বাণী সমূহের কার্যকরণ করেন। এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও ওয়াকেফহাল।"

(নূর-৫৮)

(৩) কারো গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎ অথবা কারো কাছে প্রয়োজনীয় ফরমায়েসের জন্যে সময় নির্বাচনের ভার ব্যক্তির মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শরীয়ত যে তিনটি সময়কে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে পুলেদের জন্যেও যেখানে অনুমতি সাপেক্ষ ঘোষণা করেছে তার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে সেই তিনটি সময় কারো সাথে সাক্ষাতের জন্যে উপযুক্ত সময় নয়। সুতরাং কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এই তিন সময়ে কারো ঘরে যাবার চেষ্টা করবে না। এই তিনটি সময় ছাড়া অন্য সময়ও কারো ঘরে যাবার বেলায় ভাল করে ভেবে দেখে নেয়া উচিৎ যে তাতে কারো বিরক্তির কারণ ঘটবে না তো! আর তা জানার পর প্রথমে সালাম জানিয়ে কারো গৃহে প্রবেশ করবে। এটা ব্যক্তির বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে কোন সময় কার কাছে যাওয়া উচিৎ বা উচিৎ নয়।

যেমন মনে করুন আপনার কোন বন্ধু দীর্ঘ সফরের পরে গৃহে ফিরেছেন এবং সফরের দূরীকরনের জন্যে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। তখন বিবেকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে বিশ্রাম করতে দেয়াই উচিৎ। তখন তার কাছে যাওয়া উচিৎ নয়।

অন্য একটি উদাহরণ নিন। মনে করুন আপনি আপনার কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু আপনার বন্ধু তখন পরিবারের লোকদের সাথে যদি আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন স্পষ্টতঃ তাতে পুরুষ ও মহিলা সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন। সুতরাং সে সময় তাঁর কাছে যাওয়া আপনার পক্ষে উচিৎ নয়।

কখনো কখনো এমনিও হয় যে আপনি ভেবেচিন্তে সঠিক সময়েই কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন যে আপনার বন্ধু অন্যান্য লোকদের

মধ্যে রয়েছেন বা বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার ভদ্রতা হবে যে আপনি চুপচাপ ফিরে আসবেন যেন কেউ আপনার আগমনটাই টের না পায়। নীচের আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে--

"হে ঈমানদাররা! নিজের ঘর ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না গৃহস্থদের অনুমতি পাও এবং তাদের প্রতি সালাম না পাঠাও। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা। আশা করা যায় তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আবার ওখানে যদি কাউকে না পাও তাহলে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অনুমতি না দেয়া হয়। এবং যদি তোমাকে বলা হয় যে 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যেও। এটা তোমাদের জন্যে অধিকতর পবিত্র পন্থা। এবং যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা খুব ভাল করে জানেন! (নূর-২৭-২৮)

এ ছিল কয়েকটি মোটামোটি ধরণের নির্দেশাবলি। অন্যান্য ব্যাপারগুলি মানুষের বিবেক বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, অবশ্য মানুষকে তার আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার তাগিদ করা হয়েছে এবং কারো বাড়ীতে যাবার আগে ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে তার যাওয়ার ফলে কারো কোন অসুবিধে হবে কি না, যদি এমন কোন আশংকা থাকে তাহলে না যাওয়াই উচিৎ। পবিত্র কোরানে মূলতঃ এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারো ঘরে যাতায়াতের জন্যে এটা হচেছ নিম্নতম শর্ত। এমনকি ঘরে প্রবেশের আগে স্বামীকেও স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে এবং তা করা স্বামীর জন্যে উত্তম। এসম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন···

"এটাই উত্তম যে ঘরে প্রবেশ করার আগে স্বামী স্ত্রীকে আহবান জানাবে, হঠাৎ করে ঢুকে পড়বে না, যেন সে তাকে এমন অবস্থায় না পায় যে অবস্থায় দেখা তার পছন্দনীয় নয়।"

মা এবং বোনদের ঘরেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে তা তারা সবাই একই গৃহেই থাকুক না কেন। এই অনুমতি গ্রহণ করা শুধু উত্তমই নয় বরং একান্ত প্রয়োজনীয়ও। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদের অভিমত হচেছ

"মায়ের কাছে যাবার আগে অনুমতি নেয়া জরুরী।" আতা বিন আবিরাব্বাহ্ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমাদের পৃষ্টপোষকতাধীনে কয়েকজন এতিম বোন রয়েছে। তারা আমাদের সাথেই থাকে, তাদের কাছে যাবার জন্যেও কি অনুমতি নিতে হবে? ইবনে আব্বাস জবাবে বলেন--"হ্যাঁ।" ইবনে রাব্বাহ বললেন "আমাকে অনুমতি ছাড়াই যেতে দিন।" কিন্তু ইবনে আব্বাস তা প্রত্যাখ্যান করে জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কি তাদের উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?" ইবনে রাব্বাহ বললেন "কখনো না, কক্ষন না।" এর পর ইবনে আব্বাস বললেন "তাহলে তাদের অনুমতি নিয়ে যেও।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন--আনুগত্য কি তোমার পছন্দ নয়?" ইবনে রাব্বাহ বললেন—"হ্যাঁ।" এর পর তিনি বললেন--"তাহলে তুমি অনুমতি নিয়েই ভিতরে যেও।"

বলাবাহুল্য, যেখানে স্ত্রী, মা ও বোনের ঘরে প্রবেশের জন্যে এতোটা কড়াকড়ি আদেশ সেখানে অপর স্ত্রীলোকদের ঘরে ঢোকার ব্যাপারে যে কড়া বিধি-নিষেধ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু কিভাবে অনুমতি নেয়া হবে? অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে প্রিয় নবীর শিক্ষা হচেছ--অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার ডানে অথবা বামে দাঁড়িয়ে সালাম জানাবে এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইবে। যদি ঘর থেকে কোন জবাব না আসে তহলে ফিরে চলে আসবে।

তবে আজকের যুগে পল্লীঅঞ্চলে সেই ব্যবস্থা অনেকটা চলতে পারে। কারণ পল্লীতে দরজা প্রায় সারা দিনই খোলা থাকে এবং কোন কোলাহলও থাকে না কিন্তু শহরের ঘরবাড়ীতে দরজা প্রায় সারা দিনই বন্ধ থাকে শুধু সালামের শব্দ ভিতর পর্যন্ত নাও পৌঁছুতে পারে। এজন্যে এ ধরনের অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনাকারীকে ঘরের দরজায় তিনবার টোকা দিতে হবে; যদি 'কলিংবেল' থাকে তাহলে কলিংবেল টিপতে হবে। এভাবে তিনবার দরজায় টোকা দান বা তিনবার কলিংবেল টেপার পর অনুমতি পেলে তো ভাল—নয়তো ফিরে যেতে হবে।

নারীর রূপ-লাবণ্য ও সাজসজ্জা

নারীর রূপচর্চা ও সাজসজ্জার ব্যাপারে ইসলাম কোন বয়সের বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। স্ত্রী তার স্বামীর পসন্দমতো পোষাক পরিচ্ছদ, সুগন্ধি

দ্রব্যাদি এবং অলংকারাদী ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নারীর নারীত্বসুলভ মানবিকতাই হচ্ছে তার আসল রূপসৌন্দর্য এবং উৎকৃষ্ট অলংকার। নারীর নম্রতা শিষ্টতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সততাই হচেছ তার প্রকৃত গুণাবালি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে বলেন--

> ''স্মরণ রাখ আল্লার নিদর্শনাবলি এবং জ্ঞানবুদ্ধির যা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সুন্দরতর এবং ওয়াকেফহাল।'' (আহ্‌যাব-৩৪)

এই জ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যার দাবী হচেছ যে তার মধ্যে নম্রতা ও ভদ্রতার বৈশিষ্ট্য বিকশিত হবে এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটবে। এটাই হচেছ নারীর আসল রূপ, আসল ভূষণ। তার চরিত্রই তার সর্বোত্তম অলংকার। এ ব্যাপারে মহান উমর বিন আবদুল আজীজের বোন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বললেন --''যে মনে খোদাভীতির অলংকার থাকে, অন্য কোন অলংকার তার মোকাবেলা করতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তিই কোন না কোন গুণে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত থাকে। আমার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ হচেছ দানশীলতা এবং দয়া। আল্লার শপথ, ক্ষুধার সময় সুস্বাদু খাদ্য আর শীতল পানীয় গ্রহণের চেয়ে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হচেছ দয়া, সহানুভূতি ও ভালবাসা দান করা। খোদার কসম, আমি আজ পর্যন্ত অতিমূল্যবান কোন জিনিষের দিকে আকর্ষণ বোধ করিনি, কিন্তু সৎকর্ম এবং খোদাভীতির ব্যাপারে আমি ঈর্ষাকাতর থাকি। আমার শ্রেষ্ঠ কামনা বাসনা এই যে, আমিও যেন পুণ্যবতী এবং খোদাভীরু হতে পারি। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদ শুধু কি কামনা করলেই পাওয়া যেতে পারে?''

বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে এ কথাগুলো বলেছেন একজন মহান রাষ্ট্রনেতা ও মুসলিম জাহানের সর্বজনপ্রিয় খলিফার বোন। যিনি চাইলে দুনিয়ার যে কোন অলংকার অনায়াসে অর্জন ও ব্যবহার করতে পারতেন। সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মূল্যের সৌখিন বস্ত্র, হীরা-মুক্তার স্তুব তাঁর পদচুম্বনের জন্যে প্রস্তুত ছিল কিন্তু এসব মূল্যবান বিলাস দ্রব্যাদি ছিল তাঁর কাছে আবর্জনার মতো তুচছ এসব দ্রব্যাদির দিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণও তিনি বোধ করেননি। তিনি আসলে

প্রকৃত অলংকার খুঁজে বের করেছিলেন--তা হচ্ছে সততা ও খোদাভীরুতা। তাই তিনি বলেছেন--"যে মনে খোদাভীতির অলংকার থাকে, অন্য কোন অলংকার তার মোকাবেলা করতে পারে না।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের বাহ্যিক রূপচর্চা ও সাজসজ্জাকে 'মুবাহ' অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন বলা হয়ে থাকে। যে নারী তার আসল রূপ অর্থাৎ মানবিক গুণাবলিতে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে তার কাছে এসব বাহ্যিক সেটা রূপচর্চা ও ঠুনকো সাজসজ্জাকে বড়ই অর্থহীন মনে হবে। সুতরাং কোন মেকীপনা ও ঠুনকোপনার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না।

পোষাকের সৌন্দর্য

নারীকে তার ব্যক্তিগত অবস্থা মোতাবেক পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিৎ। তার আর্থিক অবস্থা যদি রেশমী বস্ত্র পরার অনুমতি দেয় তাহলে সে পরতে পারে। (উল্লেখযোগ্য যে ইসলামের বিধান মোতাবেক নারীর জন্যে রেশমীবস্ত্র ও সোনা ব্যাবহার করা বৈধ করা হয়েছে।) এভাবে অন্যান্য কাপড়ও সে ব্যবহার করতে পারে। একথা মনে রাখা উচিৎ যে মানুষের প্রকাশ্য রূপ তার আভ্যন্তরীণ রূপেরই পরিচয় বহন করে। সুতরাং নারীর বস্ত্র ক্রয়ের সময় তার মান ও বর্ণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেয়া উচিৎ যাতে তা শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এর অন্যথা, যদি নিজের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করে বা এমন চটকদার রং বাছাই করে যা তার দ্বীনী আগ্রহের পরিপন্থী হয় বা যে পরিচ্ছেদে তার লজ্জা ও শালীনতা বজায় না থাকে, যে পোষাক পরলে পরে তার শারীরিক কাঠামো বা বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে সেই পরিচ্ছদ শুধু যে শরীয়ত বিরোধী তাই নয় বরং তাতে করে সেই নারীর চারিত্রিক অধঃপতন এবং জ্ঞান বুদ্ধির দেউলিয়াপনারই প্রমান স্পষ্ট হয়। এ ধরণের আঁটসাঁট বা চটকদার বাজে পোষাক সমাজে যতই প্রচলিত বা যতই প্রশংসনীয় হোকনা কেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য পোষাক বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম নারীকে সোনার অলংকার ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছে। এ ব্যাপারে উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা (রা) বলেন—

> "একবার (সম্রাট) নাজ্জাসী প্রিয়নবীর খেদমতে কয়েকটি অলংকার উপহার পেশ করেন, তার মধ্যে সোনার একটি আংটিও ছিল এর মুক্তোটি হাবসার। প্রিয়নবী (স) তা গ্রহণ করেন এবং তার নাত্নি আমামা বিনতে জয়নবকে ডাকলেন এবং স্নেহের সাথে তার আঙুলে পরিয়ে দেন।"

সোনাসহ রূপা, ইয়াকুত, জমরুদ, আশমাস প্রভৃতি হীরা মুক্তা ব্যবহারের অনুমতিও নারীর জন্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ এসব পদার্থের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে কোন ঘোষণা দেননি। এছাড়া নারী অন্যান্য হীরা, মুক্তা ইত্যাদিও ব্যবহার করতে পারে এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াতটি উল্লেখ করা যায়—

> "উভয় (সমুদ্র) থেকে তোমরা তাজা মাংস (মাছ) অর্জন করে থাক এবং ব্যবহারের জন্যে অলংকারের সামগ্রী বের করে থাক।
>
> (ফাতের-১২)

বলাবাহুল্য সমুদ্র থেকে যেসব মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী উত্তোলন করা হয় তার মধ্যে হীরা মুক্তা ইত্যাদিও শামিল রয়েছে। যেমন এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন—

> "এসব সমুদ্র থেকে মণিমুক্তা এবং মারজান (হীরা) বের হয়ে থাকে।" (রহমান-২২)

সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার

নারী সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে পারে কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সুগন্ধিদ্রব্যাদি ব্যবহার না করাই উচিৎ। কিন্তু স্বামীর উপস্থিতিতে এর ব্যবহার উত্তম। এ প্রসংগে একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "হযরত উসমান বিন মাজউনের স্ত্রী আগে সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যাবহার করতেন কিন্তু পরে

তিনি তা বন্ধ করে দেন। একদিন এই অবস্থাতেই তিনি হযরত আয়েশার (রা) কাছে যান। হযরত আয়েশা তাকে এই অবস্থায় দেখে অত্যন্ত বিস্মিতা হন এবং তাঁকে সুগন্ধিদ্রব্যাদি বর্জনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। কারণ, তখন তাঁর স্বামী বর্তমান ছিলেন। তিনি প্রশ্ন শুনে বললেন "ওগো উম্মুল মো'মেনিন! উসমানতো সংসার বর্জনের তালে আছে। সংসারের দিকে, পরিবার পরিজনের দিকে তার কোন লক্ষ্য নেই।" একথা শুনে হযরত আয়শা প্রিয়নবী (স) কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। সুতরাং এরপর একদিন প্রিয়নবী (স) উসমানকে দেখা পেয়ে বললেন—

উসমান! তুমিতো মুমিন এবং তৌহিদবাদী তাই না?"

উসমান বলেন—

"ওগো আল্লার রাসুল! এতে সন্দেহ কি?"

এ কথা শুনে প্রিয়নবী (স) বললেন—

"আচ্ছা, তাহলে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেপুলেদের দিকে লক্ষ্য এবং আগ্রহ দেখাও।" (হাদীস)

ইমাম শওকানী এই হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন "তার সুগন্ধিদ্রব্যাদির বর্জনে হযরত আয়শার বিস্ময় এ কথারই প্রমাণ যে বিধবা স্ত্রীদের জন্যে এর ব্যবহার মুস্তাহাব এবং মুস্তাহাসান।"

সাজসজ্জার পদ্ধতি

সাজসজ্জার দুটি প্রচলিত রীতিনীতি রয়েছে। (১) একটি হচ্ছে কৃত্রিম পদ্ধতি। যার মাধ্যমে শরীরের বিশেষ কোন অংশকে ক্ষত করে, বা কাটাকুটি করে চিত্র বা রেখা অংকন করা। অথবা অন্য কোনভাবে শরীরের স্বাভাবিক ত্বক নষ্ট করে কৃত্রিম কিছু লাগানো। এভাবে আল্লার সৃষ্টির পরিবর্তন করা কোনক্রমে বৈধ নয়।

(২) স্বাভাবিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে সুরমা, খেজাব, এবং অন্যান্য আধুনিক প্রসাধন দ্রব্যাদির ব্যবহার করার কোন বাধা নেই।

কৃত্রিম পদ্ধতি

রূপচর্চা ও সাজসজ্জার কৃত্রিম পদ্ধতি যেমন দাঁতের সজ্জার জন্যে দাঁতকে চিরে তার মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করা বা দাঁতকে ছোট করা অথবা শরীরের অন্য কোন অংশকে কেটেকুটে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হারাম। যে কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা বলতে বাধ্য হবেন যে এধরনের প্রয়াস অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচয়বাহক। বস্তুতঃ স্বভাব সৌন্দর্যের সাথে এর বিন্দুমাত্র মিলও নেই। (অথচ আজকাল তথাকথিত বিউটি পার্লারগুলোতে এ ধরনের বিদঘুটে রূপচর্চার ব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হয়।)

নিঃসন্দেহে, ইসলাম নারীদের রূপচর্চা ও সাজসজ্জায় কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে না। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম নারীর রূপচর্চা ও সাজসজ্জাকে শুধু পছন্দই করে না বরং তাকে উৎসাহিতও করে। এবং এই বিষয়টি ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও। কিন্তু রূপচর্চা ও সাজসজ্জার নামে এমন সীমা লংঘন করা যাতে শরীরকেও বিগড়ে দেয়া হবে—তা কোন যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এধরনের কুৎসিৎ প্রবণতা মহত্তম উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং এই কুপ্রথার অবসান একান্তই অপরিহার্য।

তবে, কারো শরীরের কোন অংশে যদি কোন অবাঞ্ছিত পরিবৃদ্ধি ঘটে যা তার স্বাভাবিক দেহ কাঠামোকে বিগড়ে দিচ্ছে বা তার মানবিক পীড়ার কারণ ঘটাচ্ছে তাহলে চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কেউ কোন অঙ্গের এই অংশ কেটে ফেলে তাহলে তাতে কোন আপত্তি নেই। কেন না তাতে করে ব্যক্তির জীবন তিক্ততায় ভরে উঠার আশংকা থাকে। সুতরাং এমন কোন আপদ থেকে মুক্তির জন্যে কেউ যদি তার কোন অংগের বাড়তি অংশ কেটে ফেলে তাহলে তাতে ইসলাম কোন বাধা দেয় না। কারণ ইসলাম মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে চায়। ইসলাম সহজ-সরলতারই নাম কিন্তু কেউ বিনাকারণে শুধু বিকৃত রূপচর্চার জন্যে অঙ্গহানী করতে পারবেননা যারা এমন কর্ম করে তারা আসলে তাদের মানসিক দুর্বলতারই প্রমাণ পেশ করে

ইসলাম কোন অবস্থাতেই এ ধরনের অপকার্যের অনুমতি দিতে পারে না।

''নায়নুল আওতার''-এ সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে—''দুই কিংবা চারটি দাঁতের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করা যেমন বৃদ্ধারা এবং প্রৌঢ়ারা নিজেদের বয়স কম দেখানোর জন্যে এবং দাঁতকে সুন্দর করার উদ্দেশ্য করে থাকে। স্বাভাবিক ভাবে এধরনের শূন্যতা ছোট মেয়েদের দাঁতে দেখা যায়। কিন্তু প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলারা দাঁত বড় হয়ে গেলে পরে এমনটি করে। ইমাম রাযীর মতে এটা একটা হারাম কর্ম।''

স্বাভাবিক পদ্ধতি

রূপচর্চা ও সাজসজ্জার স্বাভাবিক পদ্ধতি বলতে আমাদের অর্থ হচ্ছে সুরমা, খেজাব এবং অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্যাদির মাধ্যমে কৃত ব্যবস্থাবলি। এ ধরনের দ্রব্যাদি ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই। যদিও এসব আল্লার প্রকৃত সৃষ্টির রূপ পরিবর্তন করে তবুও তা অবৈধ নয় কারণ এই পরিবর্তন স্থায়ী নয় বরং সাময়িক এবং খুব শিগগীরই অথবা কিছুক্ষণ পর তা মিলে-মিশে-মিটে যায় এবং চেহারা আসল রূপধারণ করে। 'নায়নুল আওতার'-এর গ্রন্থাকার এ প্রসংগে বলেন—

''বলা হয়েছে হারাম শুধু ও-সব জিনিষের ব্যবহার যা স্থায়ীভাবে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু যদি তা স্থায়ী অবশিষ্ট থাকার মতো না হয় যেমন সুরমা, খেজাব ইত্যাদি তাহলে ইমাম মালেক এবং অন্যান্য উলামাদের মতে তার ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।''

নারীর সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্যই হওয়া উচিৎ

উপরে রূপচর্চা ও সাজসজ্জার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তা কেবল স্বামীকে আনন্দিত করার জন্যে এবং তার মনে নিজের জন্যে ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ নারীর রূপচর্চা এবং সাজসজ্জার উদ্দেশ্য কেবল এটাই এবং শুধু এটাই হওয়া উচিৎ। এর বিপরীত কোন মহিলা যদি পর পুরুষকে দেখানোর জন্যে এবং পর পুরুষের কাছে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্যে রূপচর্চা ও সাজসজ্জা করে থাকে তাহলে ইসলাম তার অনু-

মতি দেয় না। কারণ তা বিশৃংখলা ও নোংরামীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ কেবল সতী, চরিত্রবান এবং পরহেযগার নারীদেরকেই পছন্দ করেন। আমরা ইতিমধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করে এসেছি যে নারী তার কোন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পারবে আর কোনটা পারবে না।

মেলামেশা

আধুনিক যুগে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এক সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা যেমন জটিল তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সত্যি কথা হচ্ছে নারী যদি সতী ও পবিত্র থাকতে চায় তাহলে তার বিবেকবুদ্ধি কক্ষনো এই অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন করতে পারে না। কারণ, আমরা যাকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বলছি, তা দৃষ্টি বিনিময়, সামনাসামনি মুখোমুখি হওয়া আর তর্ক বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা ছাড়া আর কি?

নীচে আমরা সমস্যাটি নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ঘরোয়া মেলামেশা

(ক) কোন স্ত্রী তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তিকে তার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারে না। সে স্বাগত জানাবার জন্যে ও কোন পর পুরুষের কাছে যেতে পারবে না। তবে একান্ত অপরিহার্য্য কোন প্রয়োজনে সে পরপুরুষের সামনে যেতে পারে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে সে পর পুরুষের সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করবে না এবং এ ব্যাপারে তার স্বামীও যেন অবহিত থাকে অথবা আগত লোকটি এমন হবে যে তার ঘরে আপনজনদের মতো প্রায় যাতায়াতকারী হয়। যেমন পল্লী অঞ্চলে হয়ে থাকে।

(খ) স্ত্রী এবং স্বামীর নিকটাত্মীয়দের উচিৎ তারা যেন বেশী যাতায়াত না করে। আর যদি প্রয়োজনবোধে এসেও থাকে তাহলেও যেন বিনা কারণে বেশীক্ষণ বসে না থাকে। কারণ প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন—

> 'শোন। পুরুষ নারীদের কাছে যেতে বিরত থাকবে। সাহাবা জানতে চাইলেন, আল্লার রাসূল দেওরের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? প্রিয়নবী (সঃ) বললেন, দেওর তো মৃত্যু।

প্রিয়নবীর একথা বলার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর কাছে দেবরের যাতায়াত করা অত্যন্ত আশংকাজনক। কেননা স্বামী ও স্ত্রীর এই নিকটাত্মীয় ঘরে প্রায় সব সময় যাতায়াত করতে থাকে। এখন যদি তার সাথে বেশী মেলামেশা করা হয় তাহলে তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। কখনো কখনো তো হত্যা বা ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত গড়ায়।

উপরের এই নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে স্বামীর ভাই আর নিকট আত্মীয়-দের জন্যেই এতো কড়া বিধি-নিষেধ রয়েছে সেখানে সেখানে বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো তো আসা যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বাইরের মেলামেশা

আমরা আগেই বলেছি যে নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর। এ জন্যে তার বাইরে বের হওয়া সম্পর্কে কিছু দরকারী আইনবিধি থাকা আবশ্যক যেন কোন রকমের বিশৃংখলার সৃষ্টি না হতে পারে এবং তার মান মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। তবে নারীকে ঘরেই বন্ধ করে রাখতে হবে এমন কথা ইসলাম বলে না, কারণ ঘরের বাইরেও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ থাকতে পারে তা নারী হোক বা নর। সুতরাং কোন নারীকে একেবারে ঘরের বাইরে বেরুতে না দেয়া উচিত নয়। নারীও তার বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে বা নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্যে বাইরে যেতে পারে।

মহিলারা নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদেও যেতে পারে। তবে মহিলাদের জন্যে ঘরে নামাজ আদায় করাটাই অধিকতর উত্তম। এ ছাড়া চিকিৎসা, বিদ্যা-র্জন, চারিত্রিক-নৈতিক ও আদর্শিক জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেও নারীদের বাইরে যাবার অনুমতি রয়েছে। তবে এমন কোন স্থানে তাদের যাওয়া উচিৎ নয় যেখানে দুশ্চরিত্র গুন্ডা বদমাস ধরণের লোকদের আনাগোনা হয়ে থাকে।

নারী তার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হাট-বাজার এবং ক্ষেতখামারেও যেতে পারে। এভাবে প্রয়োজনের তাগিদে অন্য কোথাও যেতে বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে সত্যিসত্যিই প্রয়োজন থাকতে হবে। প্রিয়নবীর আমলে সাহাবা

(রা)-দের স্ত্রীরা প্রয়োজনবোধে যে কোন জায়গায় যেতেন। ইসলামই নারীদের এই অনুমতি দিয়েছে।

থিয়েটার-সিনেমা

গঠনমূলক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধরণের নাট্যাভিনয় বা নির্দোষ সিনেমা অথবা অন্য কোন সুন্দর স্থানে ভ্রমণ-পর্যটনের অনুমতিও রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এসব বিনোদন মাধ্যমগুলো আসলে মন্দ জিনিষ নয় বরং এক শ্রেণীর অসৎ লোক এসব মাধ্যমকে অশ্লীলতা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করেছে। আজকাল সমাজ বিরোধী লোকেরা নাটক ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এমন সব নোংরামী ও কদর্য চিত্র তুলে ধরছে যার ফলে পুরো সমাজই চরিত্রহীনতা ও যৌন অপরাধ প্রবণতার সয়লাবে ডুব ডুবু করছে। বিভিন্ন ধরণের নোংরামী ও উৎশৃংখলতা সৃষ্টির কাজে আজকের সিনেমা-থিয়েটারসমূহ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করছে। ফলে আজ মানবিকতা ও মানুষের চারিত্রিক মূল্যবোধ দারুণভাবে অবক্ষয়মান। সুতরাং নীতি ও চরিত্র বিরোধী এবং অশ্লীলতাপূর্ণ ছায়াছবি বা নাট্যাভিনয় দেখার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। অবশ্য চরিত্রগঠনমূলক বা শিক্ষামূলক পরিচ্ছন্ন ছায়াছবি ও ন্যাট্যাভিনয় দেখতে মানা নেই। কারণ ইসলাম মানুষের সৌন্দর্য ও বিনোদনপ্রীতির স্বাভাবিক আগ্রহকে অস্বীকার করে না। ইসলাম বরং নির্দোষ ও পরিচ্ছন্ন আমোদ-প্রমোদকে উৎসাহিত করে। হাদীস শরীফে এ প্রসংগে একটি ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, প্রিয়নবী নিজেই হযরত আয়েশাকে হাবশীদের খেলা দেখিয়েছিলেন।

ভ্রমণকেন্দ্র ও পার্ক

আজ পর্যন্ত আমরা ইসলামে এমন কোন কথা শুনিনি বা পড়িনি, যাতে নারীদেরকে ভ্রমণকেন্দ্র, পার্ক বা মুক্ত আবহাওয়ায় বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রিয়নবীর আমলে নারীরা শহরের বাইরেও যাতায়াত করতেন। এ প্রসংগে হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রা) বলেন—"আমি আমার স্বামী যুবাইরের

খামার থেকে নিজ মাথায় বোঝা নিয়ে মদীনায় পেঁছাতাম।" উলামারা এ থেকে প্রমাণ করেন যে সংক্ষিপ্ত সফরে নারীকে বিনা মুহাররমে সফর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আজকালও আমাদের পল্লী অঞ্চলের নারী নিজ ঘরবাড়ী থেকে ক্ষেত খামারে যাতায়াত করে। এতে কোন বাধা নেই। আমার মতে তো শহর ও পল্লীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তবে শহর এলাকায় নারীদের সাথে দুর্ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বেশীই দেখা যায়। সুতরাং এ ধরণের মন্দ পরিবেশে নারীদের বাইরে বেরুনো উচিৎ নয়। এমতাবস্থায় অসৎ ও অসভ্য লোকদের দমন করা এবং সামাজিক পরিবেশকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখা হচ্ছে শহর প্রশাসনকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার আদেশ আল্লাহ পাক কোরানের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রিয়নবী (সঃ) কে বলেছেন—

> "যদি মুনাফেক এবং ওসব লোকেরা যাদের মনে নষ্টামী রয়েছে এবং যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে যদি এসব তৎপরতা থেকে বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তোমাকে উঠিয়ে দাঁড় করাবো। এরপর তারা এই শহরে অত্যন্ত মুশকিলেই তোমার সাথে অবস্থান করতে পারবে।" (আহজাব—৬০)

সাধারণ যানবাহনে

আজকাল বড়বড় শহর নগরে সাধারণ যানবাহনের অভাবজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, ফলে নারীতো নারী এমনকি পুরুষরাও ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যায়। এমতাবস্থায় যাত্রাপথ যদি তেমন দীর্ঘ না হয় তাহলে পায়ে হেটে যাতায়াত করাটাই ভাল অথবা আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে ট্যাক্সি, রিকশা ইত্যাদি ভাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু যদি ভাড়া অতিরিক্ত হয় বা অন্য কোন আর্থিক সংকট থাকে তাহলে সাধারণ যানবাহনে যাতায়াত করা যেতে পারে। সাধারণ যানবাহনে লোকজনের ভীড় থাকে বলে নারীদের যাত্রা নিরাপদ হয়,—কোন গুন্ডাবদমাস তাদের বিরক্ত করার সুযোগ পায় না। সুতরাং উলামারা নারী-দেরকে সাধারণ যানবাহনে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন হজ্জের

সময় ভীড়ের কারণে নারীপুরুষের একত্র মেলামেশার ব্যাপারে উলামারা কোন বিধিনিষেধ সম্পর্কে নিরবতা পালন করছেন। পবিত্র কাবাশরীফের তোয়াফের ক্ষেত্রেও একই নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে কেননা এসব উপলক্ষে অধিক জনসমাগমের ফলে কোনরকমে নিরাপত্তাহীনতার আশংকা থাকে না এবং কারো মনে অসৎ ভাবনাও জাগতে পারে না।

—

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর অধিকার ও দায়ীত্ব

- নারীর উত্তরাধিকার
- নারীর শিক্ষা
- নারীর চাকরী

নারীর উত্তরাধীকার

উপস্থাপনা

আমরা আগেই বলেছি যে প্রাচীনকালে নারীর উত্তরাধিকার লাভের কোন কল্পনাও মানুষের ছিলনা। ক্রয়বিক্রয়যোগ্য কোন জিনিষের উপরই তার উত্তরাধীকার বা মালিকানা স্বীকৃত ছিলনা। উল্টো নারীকেই ক্রয়বিক্রয় করা হ'ত। এমন কি একাদশ শতক পর্যন্তও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্ত্রী ক্রয় বিক্রয় করা হ'ত। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের ছ'শো বছর পরও অমুসলিম সমাজগুলোতে এধরণের জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইসলাম আবির্ভাবের প্রায় একহাজার বছর পরে পনেরশো সাতষট্টি সালে পাশ্চাত্যে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এর অধীনে কয়েকটি বিশেষ জিনিষের উপর নারীর মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ থেকে অনুমান করে দেখুন যে ইসলাম যেখানে পনেরশো বছর আগে নারী জাতির পূর্ণ অধিকার, মালিকানা ও উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেখানে ইসলামের একহাজার বছর পর পাশ্চাত্যে নারীকে নামেমাত্র যে অধিকার দেওয়া হ'ল তাও খুব সীমিত পর্যায়ের এবং আংশিক।

এ কথাতো সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই জানেন যে আরবরা নারীকে উত্তরাধিকার অর্জনের যোগ্যই মনে করতো না। কেননা নারী ছিল দুর্বল, ঘোড়ার পীঠে চাবুক হানিয়ে ঝড়ের তেজে বসার শক্তি তার ছিল না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করাও ছিল তার পক্ষে অসম্ভব, যুদ্ধে বিজয়লব্দ ধনসম্পদ কুক্ষিগত করতেও সে ছিল অক্ষম, সুতরাং এসব কারণে তারা নারীকে ওয়ারিস সূত্রের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখে। আরব সমাজে কেবল ছেলেদেরই উত্তরাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হ'ত যারা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পীঠে চড়ে শত্রুর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম ছিল। অতএব, অন্ধকার যুগের আরব

সমাজে উত্তরাধিকার পাওয়ার প্রথম যোগ্য অধিকারী ছিল বড় ছেলে। এরপর ক্রমিকভাবে অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকার সত্ত্ব বন্টন করা হ'ত। কিন্তু এমন ছেলে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম নয় তাকেও উত্তরাধিকার দেওয়া হ'ত না। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে কেবল কন্যা সন্তানই রেখে যেত তাহলেও তার উত্তরাধিকার স্বত্ব তার মেয়েরা পেত না বরং সবকিছু চাচাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হ'ত।

ইসলামই সর্বপ্রথম মেয়েদের উত্তরাধিকার দান করে

অন্ধকার যুগে আরব সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা সম্পর্কিত বিষয়াবলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্ধকার যুগের যাবতীয় অন্যায় অবিচার ও অসাম্যের অবসান ঘটানো হয় এবং মেয়ে তথা নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওহুদ যুদ্ধের পর হযরত সাদাত বিন রবী (রা) এর স্ত্রী প্রিয়নবী (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ওগো আল্লার রাসূল! সায়াদ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি দু'জন বিবাহযোগ্য মেয়ে রেখে গেছেন। ওঁর শাহাদাতের পর তাঁর চাচা সব সম্পত্তি দখল করলেন, এখন ওদের বিয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে যা সম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রিয়নবী (স) এ কথা শুনে বললেন—আল্লার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। এরপরই উত্তরাধিকার সম্পর্কিত এই আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ বলেন—

> 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। যদি (মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ) দুয়ের থেকে বেশী মেয়ে হয় তাহলে তাদেরকে 'তরকা'র দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হোক, আর যদি একটি মেয়েই ওয়ারিশ হয় তাহলে অর্দ্ধেক 'তরকা' আর, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে তার মাতাপিতার প্রতিজনকে 'তরকা'র ৬ষ্ঠ অংশ পাওয়া উচিৎ আর

যদি সে সন্তান না রেখে যায় এবং শুধু মাতাপিতাই যদি তার ওয়ারিশ হয় তাহলে মাকে তৃতীয় অংশ দেয়া হোক, আর যদি মৃত ব্যক্তির ভাই বোনও থাকে তাহলে মা ষষ্ঠ অংশের অধিকারিনী হবে। (এসব অংশ সে সময় দেখা হবে) যখন মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। তোমরা জাননা যে, তোমাদের মাতাপিতা এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে যে উপকারের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর রয়েছে। এসব অংশ আল্লাহই নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিঃসন্দেহে সব বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং সব সুযোগ-সুবিধে সম্পর্কে অবহিত আছেন।

এবং তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু ছেড়ে গেছে তার অর্দ্ধেক অংশ তোমরা পাবে যদি সে সন্তানহীনা হয়। আর যদি সন্তান থাকে তাহলে 'তরকা'র এক-চতুর্থাংশ তোমাদের, অবশ্য তার অসীয়ত যদি পুরো করে দেয়া হয় আর তার ঋণ যদি আদায় করে দেয়া হয়—এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের 'তরকা' থেকে এক চতুর্থাংশের অধিকারিনী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাক; নয়তো যদি সন্তান থেকে থাকে তাহলে (স্ত্রীদের) অংশ হবে অষ্ঠাংশ, অবশ্য তোমাদের কৃত ওসীয়ত পূরণ করার এবং তোমাদের যে ঋণ রয়েছে তা আদায় করার পর।

আর যদি পুরুষ অথবা নারী (যার মীরাস বণ্টনের অপেক্ষায় রয়েছে) নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে; অবশ্য তার এক ভাই বা এক বোন যদি বর্তমান থাকে তাহলে ভাই এবং প্রত্যেকেই ষষ্ঠাংশ পাবে, আর ভাই বোন যদি একাধিক থাকে তাহলে মোট 'তরকা'র এক-তৃতীয়াংশের তারা সবাই শরীক হবে যদি তার কৃত ওসীয়ত পূরণ করা হয় আর যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করে দেয়া হয়—এই শর্তে যে তা যেন ক্ষতিকর না হয়। এই আদেশ হচ্ছে আল্লার পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ অত্যন্ত জ্ঞানী, দর্শী ও নম্র ভাষী।" (নিসা—১১-১২)

যখন এই আয়াত নাযিল হয় তার পরপরই প্রিয়নবী (সঃ) সেই দু'টি মেয়ের চাচাকে ডেকে বললেন—

"সাআদের উভয় মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাকে অষ্টমাংশ তাহার পরে যা অবশিষ্ট বাঁচবে তা তোমার।"

দুনিয়ার ইতিহাসে মেয়েদের উত্তরাধিকার দখলের এটাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই প্রাপ্য।

মেয়েদের তথা নারী জাতির এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিয়নবীকে কত যে সংগ্রাম সাধনা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা যে কোন সুবিচারকামী বিপ্লবী চিন্তাবিদ অনুমান করতে পারেন। কত শতাব্দি ধরে প্রচলিত প্রথা ও অন্যায় অত্যাচারের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাকে বদলে দেয়া সহজ কথা ছিল না। কিন্তু প্রিয়নবী (সঃ) আল্লার আদেশ মোতাবেক অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপোষহীন জেহাদ করতে থাকেন। এভাবে তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম সাধনার পর দুনিয়াতে প্রথমবারের মতো নারী জাতির অধিকারসহ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন। এর মাধ্যমেই নারী জাতির সত্যিকারের মুক্তির পথ সুনিশ্চিত হয়।

ইসলামের এই বিপ্লবী সাফল্যের পেছনে যেমন রয়েছে প্রিয়নবীর নিরবছিন্ন সংগ্রাম সাধনা, তেমনি নারীদের মুক্তি অর্জনের এই নতুন আদর্শ বাস্তবায়নে গোটা সমাজ পরিবেশটাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অনেক পুরুষতো এই আদেশ শুনে শংকা প্রকাশ করে পরস্পর নানা রকম কথাবার্তা বলতে লাগলো। কেউ কেউ বললো—"কি অবাক কথা; এখন স্ত্রীরা চতুর্থাংশ পাবে, মেয়েদেরকে অর্দ্ধেকাংশ দিতে হবে আর ছোট ছেলেপুলেদেরকেও 'তরকা'র অংশ দিতে হবে। অথচ তারা কেউ যুদ্ধ করে না আর যুদ্ধলভ্য সম্পদও কুড়িয়ে আনে না!" এরপর এসব ব্যক্তি নিজেরাই ভেবেচিন্তে বললো—"থাক থাক, আপাততঃ চুপচাপ সব কিছু শুনে যাও। সময় কাটার সাথে সাথে এসব কথা সবাই ভুলে যাবে অথবা এ ধরনের আইন আদেশ-গুলোকেই পরিবর্তন করে দেয়া হবে।" কিন্তু তাদের সেই ধারণার বিপরীত প্রিয়নবী (সঃ) নারীদের অধিকারদানের কথা যেমন ভুললেন না তেমনি নারী-

দের অধিকার সংক্রান্ত আইন আদেশে কোন রকম সংশোধনও করেননি বরং বরাবর তিনি এসব আইন আদেশকে কার্যকরী করেন এবং লোকদেরকে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্যে বাধ্য করেন। প্রিয়নবীর সেই ইসলামী বিপ্লব যে কতো সার্বজনীন ও সর্বাত্মক ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত নারীদের অধিকার সংক্রান্ত ইসলামী আইন ও আদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে কার্যকরী হচ্ছে। যুগ ও পরিবেশ বদলেছে সত্যি কিন্তু কোন যুগে কোন পরিবেশে ইসলামের আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি কখনোই। ইসলাম যে সর্বমানবতার চিরন্তন ও স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা এটা তারই অন্যতম বাস্তব দৃষ্টান্ত। বস্তুত: আল্লার আদেশে প্রিয়নবী (সঃ) যে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন করেন তা সর্বকালের সর্বদেশের সর্বমানবতার জন্যেই কল্যাণকর এবং অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা। কারণ এটা এই বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানুষের স্রষ্টারই দেয়া জীবন ব্যবস্থা; এটা কোন ভাবনা বিলাসীর খামখেয়ালি নয়।

তরকায় (ত্যক্ত সম্পত্তিতে) নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি কথা

নারীর তরকায় ওয়ারিশ হবার ভিত্তি হচ্ছে এই আয়াতটি—

> ''পুরুষদের জন্যে এই সম্পদে অংশ রয়েছে যা মা বাপ এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে। তা কম হোক বা বেশী (আল্লার পক্ষ থেকে) নির্দ্ধারিত রয়েছে।" (নিসা-৭)

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, নারীর অংশ ওয়ারিশদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে আর তা মৃত ব্যক্তির সাথে তার নৈকট্য ও দূরত্বের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে। এভাবে বিভিন্ন নিকটাত্মীয়দের সাথে তার মানও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, নীচে আমরা তা স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

১। ক) তরকায় বোন, ভাইয়ের অর্ধেকাংশ পাবে আর তার যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে কোরানের এই আয়াত—

> ''তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।"

খ) কিন্তু ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোন ভাই না থাকে এবং মেয়ে একা হয় তাহলে সে পুরো তরকার অর্ধেকাংশ পাবে। আর তার যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত—

"যদি মেয়ে একা হয় তাহলে তরকার অর্ধেক অংশ পাবে।"

গ) আর যদি মেয়ে একাধিক হয় তাহলে তারা পুরো তরকার দুই তৃতীয়াংশ ভাগ পাবে। আর তার যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত—

"যদি মেয়ে দুই-এর বেশী হয় তাহলে তারা পুরো তরকার দুই তৃতীয়াংশ পাবে।"

২, ক) মায়ের উত্তরাধিকার সত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরানের বর্ণনা হচ্ছে—

"যদি মৃত ব্যক্তি সন্তান রেখে যায় তাহলে তার মাতাপিতা তার তরকার ৬ শতাংশ পাবে।"

খ) "কিন্তু যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে মা মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে।"

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থেকে থাকে তাহলে তার মা পুরো সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং বাপ দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

গ) "যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে, কিন্তু ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মা ষষ্ঠাংশ পাবে।"

অর্থাৎ নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তির যদি ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে কমে ষষ্ঠাংশ হয়ে যাবে।

৩) স্ত্রীর উত্তরাধিকার সত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে—"এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের 'তরকা' থেকে এক-চতুর্থাংশের অধিকারিনী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাক। নয়তো সন্তান রেখে যাবার অবস্থায় তাদের অংশ হবে অষ্টমাংশ এরপরে যে তোমরা যে ওসীয়ত করেছো তা পূরণ করে দেয়া হবে। এবং তোমরা যে ঋণ রেখে গেছ তা আদায় করে দেয়া হবে।"

মেয়ের অংশ ছেলের অর্দ্ধেক কেন ?

বাহ্যতঃ হয়তো মনে হবে যে, ইসলাম মেয়েকে ছেলের অর্দ্ধেক অংশ দিয়ে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেনি। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। গোটা ব্যবস্থাটা সম্পর্কে যাদের পড়াশুনা ও ধারণা পূর্ণাঙ্গ নয় তারাই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। একটু ভাবনা চিন্তা করলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এটাতো জানা কথা যে পুরুষকেই পরিবার পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবার পরিজনের লালন-পালন করার এবং তাদের ভালমন্দ সব কিছু দেখা-শুনা পুরুষই করে। নারীকে এই কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া পুরুষকে নারীর মোহর ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়, বোনদের বিয়ে-শাদী দিতে হয় এবং উপহার উপঢৌকনও পাঠাতে হয়। বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভারটাও পুরুষের। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করাটাও পুরুষেরই কর্তব্য। অন্যদিকে বোনের উপর এ ধরনের কোন দায়িত্বই নেই, সময়ে সময়ে বোন ভাইয়ের কাছ থেকেই এটা-ওটা পেয়ে থাকে। বোন তার বিয়ের পর স্বামীর মোহরও পায় এবং স্বামীর সম্পত্তিতেও তার অংশ থাকে। অর্থাৎ বোন বাপের বাড়ীতেও অংশ পায় আর স্বামীর বাড়ীতেও অংশ পায়। অন্যদিকে ভাই কেবল একদিকেই অংশ পায়। তা ছাড়া বোনের কোন দায়িত্ব নেই অথচ ভাইকে সবদিক দেখাশুনা করতে হয় প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দিতে হয়। সন্তানাদির জন্মের পর ভাইয়ের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। যেমন তাদের লালন পালন চিকিৎসা শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নারীকে কোন দায়িত্ব পালন করতে হয় না।

এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সব ক্ষেত্রে সব দিকে সব রকমের দায়-দায়িত্ব কেবল ভাইকেই পালন করতে হয়। যত পরিশ্রম যত সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং এই গুরুদায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভাই যদি বোনের চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকে তাহলে সে খুব একটা যে বেশী পাচ্ছে তা নয়। অথচ বোন অর্থাৎ মেয়ে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ পাওয়ার সাথে সাথে স্বামীর কাছ থেকে মোহর ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সব কিছুই পাচ্ছে। তাকে কারো কোন আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতাও করতে হয় না উভয়পক্ষ থেকে উপহারাদিও সেই পায়। এসব বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই ইসলামের এই বণ্টন

ব্যবস্থাকে ও ইনসাফভিত্তিক বলতে বাধ্য হবেন। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে যদি পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশী অংশ না দেয়া হ'ত। সুতরাং দায়িত্ব পালনের দৃষ্টি-কোণ থেকে পুরুষের জন্যে অর্দ্ধেক বেশী বরাদ্দ করে ইসলাম অত্যন্ত বাস্তব-ভিত্তিক সুবিচারই করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আধুনিক যুগে যখন নারী ও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজকর্ম করছে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে আর উপার্জন করে ব্যয়ভার নির্বাহে সহযোগিতা করছে তাহলে এখনও কি পুরুষের অর্দ্ধেকই অংশ পাবে? যুগের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে তরকার বন্টনেও পূর্ণ সমতা স্থাপন করা উচিৎ।

এ ধরনের প্রশ্ন ও মন্তব্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু প্রযোজ্য নয়। (আসলে নারী আয়-উপার্জন করলেও দায়-দায়িত্ব ঠিক আগের মতো এখনো পুরুষকেই পালন করতে হয়। নারী আগের মত এখনো পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহ থেকে সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে মোহর ও উপহারাদি পেয়ে থাকে এবং আজকাল সে যে আয়-উপার্জন করে থাকে তাও সম্পূর্ণরূপে তারই এক্তিয়ারে থাকে। তার এই অর্জিত অর্থ সে কাউকে দিতে বা সে কোন রকমের দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। কিন্তু আগেকার যুগের মতো আজকের পুরুষকেও সব রকমের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। যুগ পাল্টালেও আসল অবস্থা ও ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং ইসলাম যে নীতি ও বিধি প্রবর্তন করেছে তা এখনো তেমনি কার্যকরী থাকা জরুরী।)

আসল অবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ অবগতি না থাকার কারণেই কোন কোন বিভ্রান্ত লোক ইসলামী আইন বিধি সংশোধনের কথা বলে থাকেন এবং নারী পুরুষের পূর্ণ সাম্যতার ওকালতি করেন। তারা প্রকৃতপক্ষে কথার মারপ্যাঁচে আটক পড়েছেন। অবাস্তব যুক্তির গোলক ধাঁধায় জড়িয়ে পড়ে তারা আল্লার কোরানের এই আয়াতের পরিপন্থী কথা বলেন– যে আয়াতে আল্লাহ বলে-ছেন—

"পুরুষ নারীর উপর দায়িত্বশীল, এই ভিত্তিতে যে, আল্লাহ এদের মধ্যে প্রত্যেককে পরস্পরের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই ভিত্তিতে যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।" (নিসা-৩৪)

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিভ্রান্ত লোকেরা মনে করে যে "যেহেতু নারী জীবনের সব দিক ও বিভাগে কাজ করতে শুরু করেছে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আজ তারা আর পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়—বরং তারা আজ পুরুষকেই সাহায্য সহযোগিতা করছে। এই জন্যে পুরুষকেই দায়িত্বশীল মনে করার কোন কারণ নেই এবং যে যুগে এই আয়াত নাযিল হয়েছে এখন সে যুগ নেই। তাই সেই নীতি ও আইন এখন অবশ্যই বিলুপ্ত হওয়া দরকার।"

এ ধরনের কিছু প্রশ্নের জবাব আমরা একটু আগেই দিয়েছি। এখন আমরা আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টার পর্যালোচনা করব। আসলে আধুনিক যুগে ইসলামী আইনের কার্যকরীতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের আপত্তিতে কোন যুক্তি নেই এবং তাদের প্রশ্ন ও আপত্তি বাস্তবের আলোকে খুবই নিষ্প্রভ প্রমাণিত হয়।

আপত্তিকারকরা এটাতো স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে পান যে নারীরাও কাজ করছে; কিন্তু তাদের কাজের ধরণ-ধারণ, তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং তাদের কাজকর্মে নিয়োজিত থাকার আনুপাতিক হার এবং কাজের মান গুরুত্ব কোন পর্যায়ের ইত্যাদি বুনিয়াদি প্রশ্নের জবাব একান্তই নৈরাশ্য ব্যাঞ্জক তারা যে সব কাজ করে এবং যে সব কাজ করতে সক্ষম তা খুবই নগণ্য পর্য্যায়ের। তুলনামূলকভাবে একান্তই গুরুত্বহীন তা ছাড়া তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে যে সব জটিল, আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংশটাই অনেক বড়। এর পরিণতিতে আধুনিকা নারী উন্নত চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে আধুনিক নারী তার আত্ম-মর্যাদা

এবং সেই সম্মান থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েছে যা সে মা ও স্ত্রী হিসেবে পেয়ে আসছিল, যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলাম তার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিল আজ সে সব গুণ ও বৈশিষ্ট বর্জনের ফলে আধুনিক নারী একান্ত গুরুত্বহীন এবং উপেক্ষিত জীবে পরিণত হচ্ছে। আজ আধুনিক নারী নিজেদেরই হঠকারীতার কারণে পুরুষের ভোগ্য ও পণ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে, কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে আজ তার ব্যক্তিত্ব ধুলোয় লুটোচ্ছে। বস্তুতঃ আধুনিক নারী আজ অভদ্র ও চরিত্রহীন পুরুষদের খেলা ও চিত্তবিনোদনের একটি তুচ্ছ মাধ্যমেই পরিণত হয়ে গেছে। ইসলাম নারীর এই অধঃপতন ও অবমাননা দেখতে অনিচ্ছুক। ইসলাম আগের মতো এখনো এবং অনাগত ভবিষ্যতেও নারীর আসল অধিকার বহাল করতে চায়। সুতরাং ইসলামী নীতি ও আইনের সংশোধনের প্রশ্ন কোনদিনই উঠতে পারে না। ইসলামী আইন ও নীতি ছাড়া নারী বা পুরুষ কারো অধিকার ও মর্যাদা বহাল থাকতে পারে না; বলাবাহুল্য ইসলাম গোটা বিশ্বমানবতার সর্বকালের শাশ্বত প্রয়োজন। এর প্রয়োজন কোনদিন কোন যুগে শেষ হবে না।

কোরানের আয়াত আসলে ইসলামের সামাজিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তার স্পষ্টিকরণ হিসেবেই নাজিল হয়েছে যা যে কোন পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়ীত্বের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে বুনিয়াদি নীতি মোতাবেক পুরুষই হবে পরিবারের প্রধানদায়িত্বশীল। এটা একান্তভাবেই স্বভাবসম্মত কথা। পুরুষই ঘরবাড়ী ও পরিবারের সব প্রয়োজন পূরণ করবে এবং এ ব্যাপারে পুরুষকেই সবার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটাই আর তার অভ্যন্তরীণ অর্থ সেই মানসিক বিধির স্পষ্টিকরণের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

—০—০—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারী শিক্ষা

উপস্থাপনা

সন্তানের কাছে যদি কোন ধন-সম্পত্তি না থাকে তাহলে তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের পুরো দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত থাকবে। আর এই দায়িত্ব শুধু খাওয়ানো পরানো পর্যন্তই সীমিত থাকবে না, বরং সন্তানদের লিখিয়ে পড়িয়ে নীতিতে-চরিত্রে সত্যিকারের ভদ্র মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলাও তার দায়িত্ব, যাতে করে করে তারা জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যথার্থভাবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। যদি কোন পিতা তাঁর এই কর্তব্য পালনে কোন রকমের অবহেলা করে তাহলে প্রিয়নবীর পবিত্র হাদীস মোতাবেক তিনি পাপের ভাগী হবেন। প্রিয়নবী বলেছেন—

> "মানুষের পাপী হবার জন্যে একথাই যথেষ্ট যে যাদেরকে সে খাওয়ায় তাদেরকে নষ্ট করে দেয়।" অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক যাদেরকে লালন-পালন করে।"

(আবুদাউদ-নাসাই-হাকেম)

ইসলাম পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের উপর এতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে যে তাকে আল্লার পথে ব্যয় থেকেও উত্তম বলে ঘোষণা করেছে। যেমন, প্রিয়নবী বলেছেন—

> "সবচেয়ে উত্তম দীনার (মুদ্রা)—যা মানুষ ব্যয় করে সেই দীনার যা সে নিজের পরিবার পরিজন ও সন্তানদের জন্যে ব্যয় করে, এবং সেই দীনার যা সে নিজের ঘোড়ার করে আল্লার পথে জিহাদ করার জন্যে ব্যয় করে, এবং সেই দীনার যা সে নিজের সাথীদের মধ্যে আল্লার পথে ব্যয় করে।" (মুসলিম—তিরমিজী।)

আবু কালাবা এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—"যেহেতু হাদীসে সর্ব প্রথম পরিবার পরিজন ও সন্তানদের কথা বলা হয়েছে এজন্যে যারা নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্যে ব্যয় করে আল্লাহ্‌ তাদের আয় উপার্জনে সমৃদ্ধি দেবেন এবং তাদেরকে অভাব অনটন ও দারিদ্র থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

পরিবার পরিজন তথা সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করার উপকারিতা সম্পর্কে প্রিয়নবীর অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে অল্প বিস্তর জ্ঞান সবারই থাকার কথা। সুতরাং আমরা আর বিস্তারিত উল্লেখ করছি না। আর এমনিতেও প্রতিটি ব্যক্তি তার সন্তানদের জন্যে স্নেহ ভালবাসা বশতঃ ব্যয় করেই থাকে। এ পথে যত দুঃখ বিপদ ও সমস্যা আসে সে তা হাসি-মুখে সহ্য করে, কারণ এর সম্পর্ক ব্যক্তির হৃদয় ও আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। হৃদয় ও আবেগের এই ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে সে সবসময় প্রস্তুত থাকে। এটা মানুষের স্বভাব। দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি খুব মুশকিলেই পাওয়া যাবে যে তার স্বভাবের এই ডাকে সাড়া দেবে না। আর লাখের মধ্যে দু' একজন এমন লোক পাওয়া গেলেও তারা হিসেবে পড়ে না। সুতরাং দেখা যায় যে ব্যক্তি ধনী হোক বা দরিদ্র নিজের আয় উপার্জন মোতাবেক নিজের পরিবার ও সন্তানদের জন্যে ব্যয় নির্বাহ করে।

ছেলে-মেয়ে সমান গুরুত্ব

ইসলাম এসেছে অন্ধকার যুগের কঠিন বুক বিদীর্ণ করে। গভীর সমাচ্ছন্ন পরিবেশে স্নিগ্ধ আলোর শিখা হয়ে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় চারিদিকে। তখনো অন্ধযুগের ধ্বংসস্তুপ থেকে কখনো কখনো ধোঁয়ার কুন্ডালি পাক খেয়ে উঠছিল। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল অন্ধকারের আবছা-অবশেষ। এমনকি কোন কোন আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানও অন্ধকারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করে উঠতে পারেনি। তখনো অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্মে দারুনভাবে দুঃখিত হয়ে পড়তো। তখন সারা দুনিয়ার মতো আরবের লোকদের কাছেও মেয়ে বা নারীর কোন মূল্য বা মর্যাদা ছিল না। মেয়ের জন্মে তারা যেমন নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে পড়তো তেমনি ছেলের জন্ম হলে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। তারা অনেক সময় তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে স্বস্তির শ্বাস নিতো। ভেবে দেখুন, সেই সময়ে সেই

পরিবেশে মেয়ের জন্মটা তাঁদের কাছে কতোটা অবাঞ্ছনীয় ছিল। সেই যুগের লোকদের এই ঘৃণ্য মানসিকতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে পবিত্র কোরানের এই আয়াতে—

> "আর যখন এদের মধ্যে কাউকে কন্যা জন্মেছে বলে খবর দেয়া হয় তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যায় এবং সে বিষ পান করার মতো হয়ে যায়। এই খবরে যে লজ্জার রেখাপাত করে তার কারণে লোক-দের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় আর ভাবে যে, অপমানের সাথে মেয়েকে রেখে দেবো, নাকি মাটিতে পুঁতে দেবো? কি মন্দ সিদ্ধান্ত এসব লোক নিয়ে থাকে।" (নহল— ৫৮-৫৯)

ইসলাম এসে যুগ-যুগান্তরের প্রতিষ্ঠিত এসব বাতিল ধারণাও বিভ্রান্তির সমূলে উৎখাত করে, মানুষের মন মগজ থেকে কুসংস্কারের প্রভিবল আবর্জনা থেকে পাক পবিত্র করে, ঘরে-বাড়ীতে নারীর স্থান ও মর্যাদা নির্দ্ধারণ করে, তার অধিকার ও দায়িত্ব বন্টন করে, মহা জীবনের অব্যাহত অভিযানে তাকে সহগামীনির সম্মান দেয়, পিতা স্বামী এবং অন্যান্যদের উপর তার অধিকার ঘোষণা করে, তার জন্যে সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দুয়ার খুলে দেয়। মেয়েদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী ঘোষণা করেন—

> "যাদেরকে আল্লাহতায়ালা কিছু মেয়ে দান করেছেন, তারা যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে তাহলে তারা ওদের জন্যে জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।" (বুখারী)

হাদীসে উল্লেখিত "উত্তম ব্যবহারের অর্থ' হচ্ছে তাদের উত্তমভাবে লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলিতে উন্নত করে গড়ে তোলা যাতে জীবন সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে। বলাবাহুল্য সত্যিকারের শিক্ষা ছাড়া তা সম্ভব নয়। এই শিক্ষাই নর-নারীকে যথার্থ মানুষ তথা সত্যিকারের মুসলমানে পরিণত করে। সুতরাং অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী (সঃ) ঘোষণা করেন—

> "যার কাছে তিনটি বোন বা তিনটি মেয়ে আছে অথবা দুটি বোন বা

দুটি মেয়ে আছে, আর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে," (অন্য বর্ণনা মোতাবেক) সে তাদের আদব কায়দা শেখায়, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, তাদের বিয়ে দেয় তাহলে তার জন্যে জান্নাত রয়েছে।"

(আবু দাউদ)

শুধু তাই নয়। ইসলাম নারীর হৃত অধিকার পুনর্বহাল করেছে। বরং তাকে ছেলের বরাবর এবং কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী অধিকার দান করেছে? মেয়ে বা নারীকে কোন ক্ষেত্রেই অবহেলা করার সুযোগ ইসলাম দেয়না, ইসলাম এমন পিতাকে, যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাথে সমান ব্যবহার করেছে বিরাট পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছে। তাই প্রিয়নবী বলেছেন—

"যার ঘরে মেয়ে রয়েছে এবং সে যদি তাদের কবরস্থ না করে, তাদের অপমান ও ঘৃণা না করে, নিজের ছেলেদেরকে তাদের উপর অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ-তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।"

(আবুদাউদ)

ইসলামের এসব শিক্ষা ও কর্মনীতিকে সামনে রাখুন এবং অতীত অন্ধকার যুগ ও আধুনিক অন্ধকার যুগের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করে নিরপেক্ষভাবে বলুন যে নারীর সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে না অন্য কোন বাতিল মতবাদ দিয়েছে? ইসলাম ছেলে ও মেয়ের অধিকার ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিচার ভিত্তিক ব্যবস্থা দিয়েছে তার কোন তুলনা অন্য কোথাও দেখা যায় কি? বস্তুতঃ শুধু ইসলামই ছেলেমেয়েকে একই গুরুত্ব একই মর্যাদা, এবং সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ একই অধিকার দান করেছে। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতির সবক্ষেত্র ইসলাম মেয়েদের জন্যেও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এরপরও কেউ যদি এটা মনে করে যে নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম তাহলে সে ব্যক্তি যে নিরেট মূর্খ এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ তাতে কোন সন্দেহ থাকেনা। কারণ তার এই ধারণা ইসলামের বাস্তব শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

জ্ঞান শিক্ষা (ফরয) অপরিহার্য

ইসলামে জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্যে অবশ্য কর্তব্য (ফরয) ঘোষণা করা হয়েছে। ইবনে মাজায় অকাট্য প্রমানের সাথে এই সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে—

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয।" (ইবনে মাজা)

(এই হাদীস সম্পর্কে ইরাকী তাঁর 'তাখরিজ আল এহইয়া' গ্রন্থে লিখেছেন কোন কোন ইমাম এই হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে নিখুঁত বলে স্থির করেছেন নিখুঁত বা সহীহ্ হাদীসের কয়েকটি প্রধান শর্ত হচ্ছে ১) অব্যাহত ধারাবাহিকতা অর্থাৎ মাঝখানে কোন বর্ণনাকারী অবর্তমান থাকবে না। ২) বর্ণনাকারী সুবিচারক এবং চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলিতে নির্ভরযোগ্য হবেন। ৩) স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও বিজ্ঞ হবেন। ৪) শুধু একটির নয় বরং কমপক্ষে কয়েকটি হাদীসের বর্ণনাকারী হবেন। ৫) কোন রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবেন।)

"প্রতিটি মুসলমান" অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম নর নারী। এ সম্পর্কে আলেম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের কারো মতভেদ নেই। অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে কমপক্ষে এতটুকু শিক্ষা অবশ্যই অর্জন করতে হবে যেন তারা জীবনের মৌলিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আবু কালাবার আরেকটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। "এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে, যে ছোট ছোট সন্তানদের পেছনে এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করে যে আল্লাহ্ যেন তাদের জীবনকে ষোলকলায় সুন্দর ও সততার গুণে সমৃদ্ধ করেন এবং তার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে এবং কোন ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষি থাকবে না।" বলাবাহুল্য, যারা সন্তানের জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে এবং উত্তম শিক্ষা ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হবার জন্যে সাধ্যমত ব্যয় করে তারা সত্যই বড়ড ভাগ্যবান।

এতে করে বুঝা গেল যে, মাতাপিতার কাছে সন্তানের অন্যান্য অনেক অধিকারের মতো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে এই যে তারা ছেলেমেয়েদের

শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে তাদেরকে সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবে। যদি কোন কারণে পিতা তার ছেলেমেয়েদের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পূরণে অক্ষম হয় তাহলে এই দায়িত্ব সরাসরি সরকারের উপর বর্তাবে। রাষ্ট্রের মুসলিম ছেলে মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা সরকার ও জনগণের অন্যতম প্রধান ফরয। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া মানব জীবনের কোন অর্থই হয় না।

ইসলাম সমাজকে শান্তিময় ও কল্যাণমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্যে জনগণের পাঁচটি মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়। আর তা হচ্ছে শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। ইসলামের দৃষ্টিতে অন্নবস্ত্রের চেয়েও বিরাট সমস্যা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চারিত্রিক অধঃপতনের সমস্যা। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুললে অন্যান্য সমস্যা সমাধান সহজ হয়ে যায়। কারণ অন্ন বস্ত্রের সমস্যা সাধারণতঃ অসৎ লোভী লোকদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী শোষক ও সমাজবাদী বাটপাড়রা যদি জনতার অধিকার ও স্বার্থ নিয়ে ছিনি মিনি না খেলে তাহলে দুনিয়াতে কোনদিন অন্নবস্ত্রের সমস্যা দেখা দেবেনা। তা ছাড়া অন্ন বস্ত্রটা মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে নয় বরং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলার জন্যে জীবন ধারণের মাধ্যম মাত্র। তাই ইসলাম বিশেষত সমাজকে সুসভ্য বানাতে চায় এবং মানুষকে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বুনিয়াদের উপর সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। আর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না মন মগজকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার জন্যে প্রস্তুত করা হয়। এজন্যে ব্যক্তি জনগণ ও সরকার যদি ব্যক্তিগত সামষ্টিক পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আদর্শ ও কল্যাণমূলক সমাজের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলাম এমন ধরনের তথাকথিত কোন সরকারকে অস্বীকার করে যার কাজ হয় শুধু আইন প্রণয়ন করা আর কর উসুল করা। এর বিপরীত ইসলামী সরকার হবে সম্পূর্ণরূপে গণকল্যাণমুখি এবং জনগণের ইমান আকীদা ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ইসলামী সরকার এমন

শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করবে যার মাধ্যমে জনগণের বৈষয়িক সমস্যাবলির সমাধানের সাথে সাথে নৈতিক ও চারিত্রিক মানও উন্নত হবে।

প্রিয়নবী বলেছেন "আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।" অর্থাৎ তিনি গোটা বিশ্বমানবতার শিক্ষক। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হল জাতির প্রধান শিক্ষক। জনগণকে শিক্ষার সবরকমের সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তিনি এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন যার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনমান উন্নত হবে এবং শান্তি-শৃংখলা ও পারস্পরিক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিও অর্জন করবে। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রবর্তন করা ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব। যদি সরকার এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে তাকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে। যে রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে আগ্রহ নন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি প্রিয়নবীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নন।

নারীর শিক্ষাক্ষেত্র ও সীমা

ইসলাম নারীর উপর যে বিরাট দয়া ও মহানুভবতা দেখিয়েছে তা সর্বজন স্বীকৃত কথা। ইসলামের ঘোর সমালোচকরাও এ কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো ইসলাম নারীকে কোন ধরনের শিক্ষা দেয়? এর জবাবে প্রথম যে কথাটি বলা যায় এবং যে সম্পর্কে কারো কোন মতভেদ নেই তা হলো, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ভদ্র, নম্র, চরিত্রবান ও সুশৃংখল করে তোলা। শিক্ষা মানুষের মধ্যে দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতার সৃষ্টি করে— যা তার জীবনের সব ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে। আর এই উদ্দেশ্য শুধু নারীর জন্যেই নির্দিষ্ট নয় বরং নারী পুরুষ উভয়ের ব্যাপারেই এ কথা প্রযোজ্য।

ইসলামী নারী ও পুরুষকে এক বিরাট দ্বীনি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর এটাই হচ্ছে মানব জীবনের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্য কথায় বলতে গেলে এই দ্বীনি দায়িত্বই হচ্ছে মানব জীবনের

মূল ভিত্তি। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নর ও নারী উভয়ের উপর বিভিন্ন কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে : যেমন আমরা আগেই বলেছি এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্ক মানুষের আকীদা বিশ্বাস এবং কর্ম ও চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এই জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের মান এবং আল্লার আদেশ ও ইবাদতের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম থাকবে, নীতি ও বিশ্বাসের অর্থ না জানবে, সত্য ও মিথ্যার দর্শন না জানবে, সামাজিক জীবন-যাপনের আইন-কানুন না জানবে, মোটামুটি চারিত্রিক জ্ঞান না করবে, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগতি অর্জন না করবে এবং এটাই যদি না জানে যে, সত্যিকারে শিক্ষাই তাকে সচেতন ও সজাগ মানুষে পরিণত করে, তাকে জীবন ও মহাপ্রকৃতির গোপন রহস্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করে, জুলুম ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্তি ও আলোর পথে ঠেলে আনে; তাহলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত অজ্ঞ ও অদূরদর্শি। এ ধরনের মানুষকে তার অজ্ঞতার পরিণতিতে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। এ ধরনের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেন—

> "হে ইমানদাররা! নিজেকে নিজে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর।" (তাহরীম—৬)

এই আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে এর মধ্যে নর ও নারী উভয়ই শামিল রয়েছে। বলাবাহুল্য যারা আল্লার ও বান্দার অধিকার সম্পর্কে অনবহিত তারা নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে কেমন করে?

সুতরাং মানুষকে তার নিজের জন্যে, পরিবার-পরিজনের জন্যে এবং গোটা সমাজের জন্যে জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতের সব সমস্যা থেকে মুক্তি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করার জন্যে আল্লাহ বলেছেন—

"নারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তার অধিকারও রয়েছে।"

এভাবে পুরুষেরও কিছু দায়িত্ব এবং কিছু অধিকার রয়েছে। এই দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকলেই স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন হবে শান্তিপূর্ণ। কিন্তু যদি সেই জ্ঞানই না থাকে তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন কি সুখী-শান্তিপূর্ণ হতে পারে? একইভাবে নারীর উপর পুরুষকে দায়িত্বশীল করা এবং নারীকে শান্তির প্রতীক ও উৎস হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক ও মনস্তাত্বিক জিজ্ঞাসার জবাব স্পষ্ট হয়ে যায়। এবং যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ও অনুভূতিজনিত সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে এ জন্যে এটাকেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি দ্বার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এতে করে মানুষের চিন্তাধারায় মধুময় অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতার সৃষ্টি হয় এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ নারী ও পুরুষের অধিকার সংরক্ষণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রিয়নবী বলেছেন—

> "নারী তার স্বামী গৃহের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
>
> (ইমাম আহমদ, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)

এই দায়িত্বের বিভিন্ন পর্যায় থাকতে পারে যেমন, অর্থনৈতিক পর্যায় শারীরিক পর্যায়, সামাজিক পর্যায়, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক পর্যায়। আমরা এখানে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। কারণ আজকের যুগে এটাই মানুষের আসল দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটা প্রত্যেক পরিবারের অন্যতম বুনিয়াদী সমস্যা।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শ স্ত্রী তাকে বলা হয় যে অত্যন্ত মামুলি ধরনের মাসিক আয় দিয়ে নিজের পারিবারিক ব্যয় বাজেট পূরণ করতে সক্ষম। এটা একটা স্বীকৃত নীতি। তবে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখী রাখার উদ্দেশ্যে সচ্ছল ও সমৃদ্ধ জীবনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বরং বলতে হয় পারিবারিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ, সহজ ও সুশৃংখল রাখার জন্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত

হচ্ছে পর্যাপ্ত আয়-উপার্জন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে কখনো অনটনে রাখতে নেই এবং প্রয়োজনবোধে কিছু বেশী টাকা দেয়াই ভাল যাতে সে সুন্দরভাবে পারিবারের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই জন্যে পুরুষকে যথাসম্ভব বেশী করে হালাল আয়-উপার্জনের চেষ্টা করা উচিৎ।

আরেকটি প্রশ্ন হলো স্ত্রী তার সন্তানদের লালন-পলন ও তত্ত্বাবধান কিভাবে করবে? এখানে লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান বলতে শুধু খাওয়ানো পরানোকেই বুঝানো হচ্ছে না বরং সন্তানের মানসিক ও চারিত্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের কথাও বুঝানো হচ্ছে। কেননা শিশু সন্তান নিজের ভালমন্দ কিছুই বুঝে না। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে কোন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে করে তারা মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে শান্ত ও ভদ্র তথা আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

নিঃসন্দেহে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব তখন আরো অনেক বৃদ্ধি পায় যখন সে সন্তানদের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও ইসলামী শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রত গ্রহণ করে। এজন্যে নারীকে আগে থেকেই ইসলামের সামাজিক ও সার্বজনীন জ্ঞান অর্জন করে রাখা উচিৎ। যেমন ইসলামী আদর্শ সম্পর্কিত সাধারণ দর্শন ইসলামের সামাজিক বিধি, ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও সাহিত্য-সাংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত পড়াশুনা করা দরকার। এ ধরণের পড়াশুন্য শুধু সখের জন্যেই করবে না বরং এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করবে এবং নিজের সন্তানদের ব্যক্তিত্বও গড়ে তুলবে। মাকে বরং নিজের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তাঁর সন্তান তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই সুসভ্য হয়ে উঠবে। অবশ্য এ প্রসংগে আমরা আদর্শ মায়ের গুণাবলি আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান বিষয়কে দীর্ঘায়িত করতে চাইনে কারণ এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু পরিবারের প্রতিষ্ঠাকারী কর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। কেনন; ইসলাম তাকে এই যে দায়িত্ব দিয়েছে তার দাবী হচ্ছে সে তার সাধ্যমত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের সাথে পরিচয় লাভ করবে এবং সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে এই দায়িত্ব পালনে

সহায়তা ও সুযোগ সুবিধা দান করা এক্ষেত্রে তার অধিকার সম্পর্কে ইতি-পূর্বে আলোচনা হয়েছে বিধায় এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া একজন দায়িত্বশীল নারীর চিন্তাধারা এবং মনস্তাত্বিক অবস্থা তার প্রভাব গ্রহণ করা ছাড়া থাকতে পারেনা। কারণ দায়িত্ব অনুভূতির মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের অনুভূতিব পরিচয় পাওয়া যায়। এ থেকে সে তার দায়িত্ব পালনের অনুপ্রেরণা পায়। আর এই অনুভুতিই তার মর্যাদা ও গুরুত্বকে এতোটা বাড়িয়ে দেয়। বস্তুতঃ এই অনুভূতিই মানব মানসিকতাকে সামগ্রীক প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং ব্যক্তিকে সচেতন ও সতর্ক রাখে, তার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমস্যাবলির সব দিক ও বিভাগ নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে সক্ষম করে। আর এই অনুভূতিই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে একটি মজবুত অবলম্বন এবং তার পূর্ণতা অর্জনের বুনিয়াদী উপাদান বলে প্রমাণিত হয়।

এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা যে, প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য হচেছ জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা দান করা। সুত-রাং নর ও নারীর শারীরিক গঠনে যে ব্যবধান রয়েছে তা সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, পথ দুটোর মধ্যে কোন্ পথটি সমাজের জন্যে অধিকতর উপকারী এবং স্বভাবসম্মত ? তাকে কি সেই শিক্ষা দেয়া হবে, যার মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোতাবেক জীবনযাপন করবে না কি সেই শিক্ষা দেয়া হবে যা শিখে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিরোধী পথ অবলম্ব করবে ?

ইসলাম আমাদেরকে একথা বলেনা যে, নারীর জ্ঞানবুদ্ধি পুরুষের বরাবর নয়, অথবা আমরা একথাও মানি না যে, যেসব জ্ঞান ও কলাকৌশল পুরুষ শিখতে পারে তা নারী শিখতে পারেনা। এসব কোন কথাই নয়। তবে আসল কথা এবং প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে প্রকৃতিই কর্মক্ষেত্রের যে স্বাভাবিক বন্টন করে রেখেছে সে অনুযায়ী তাদের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের সীমা বন্টনও জরুরী কি না ?

আসলে নারীর সৃষ্টি উদ্দেশ্যই হচেছ তাকে আদর্শ মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রাকৃতিক সত্যের উপরই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। বলাবাহুল্য

আল্লার সব পরিকল্পনারই একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। বৃহত্তর কল্যাণই সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এজন্যে আমরা যদি নারীকে তার প্রকৃতির দাবী মোতাবেক আসল শিক্ষা না দিই তাহলে অন্য শিক্ষার মাধ্যমে সে যা কিছুই হোক না কেন প্রকৃত পক্ষে একজন আদর্শ নারী ও আদর্শ মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। অথচ আদর্শ মা হওয়ার মধ্যেই নারীর স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে।

আজকের আধুনিক নারী কৃষি বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান এবং কলা ও প্রকৌশল বিজ্ঞানে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এছাড়া সাহিত্য ও চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব শিখে নারী হিসেবে তার কি উপকার বা কি উন্নতিটাই হচ্ছে। পুরুষের কাজ করাই কি নারীর উন্নতির প্রমাণ। আসলে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নারী তার নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা থেকেই বাদ পড়ে গেছে। পরিণতিতে নারী, নারী না থেকে কৃত্রিম পুরুষেই পরিণত হচ্ছে। এটাকেই যদি কেউ বাহাদুরী বলে মনে করে তাহলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আমরা অবশ্য এটা বলছিনা যে, নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তার গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতায় হারিয়ে ফেলেছে। না তা নয়। আসলে নারী নিছক দেহসর্বস্ব কোন বস্তু নয়। বরং নারীত্বের আধ্যাত্মিক মান ও বিধিই হচ্ছে তার আসল জিনিষ। এটা এক ধরনের স্বাভাবিক গুণ ও ক্ষমতারই নামান্তর মাত্র। এরই মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মানবিকত্ব পরস্পর থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। একজনের মনমেজাজ অন্যজনের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। আর এসব কিছু এজন্যেই যে তা জীবনের কর্মক্ষেত্রে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন যথার্থভাবে পালন করতে পারে। এটাই সেই বিশেষ কথা যা নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য সময় রাখতে হয় যা সে ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় তাহলে তার নারিত্বের ক্ষমতা ও গুণাবলী নষ্ট হয়ে যাবে বরং সে অবাঞ্ছিত বিকৃতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিলাদের চাকুরী

প্রথম কথা

মহিলাদের চাকুরীর কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নানারকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ (UNO) পুরুষ ও নারীদের একই কাজের জন্যে সব অংশের বেতন বরাদ্দকরণে ব্যর্থ হয়েছে। স্বয়ং ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরাই নারী পুরুষের পারিশ্রমিক বা বেতনের সমতার ঘোর বিরোধী। তারা নারী পুরুষের সম-বেতনের ফলে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হবে বলে যুক্তিপ্রদর্শন করছেন।

আজ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং আইনবিদরা সর্বসম্মত ভাবে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে নারী শুধু সেই কাজের জন্যেই উপযুক্ত যা তার স্বভাব ও মানসিকতার অনুকূল। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ব্যবধান রয়েছে তার সীমা লংঘন করা হচ্ছে বলেই আজকের সমাজ অবনতশীলতার চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক ও মূল্যবোধের অভাব ঘটেছে।

আজ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলোতে এমনকি পাশ্চাত্যের অনুকরণকারী মুসলিম দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের বীভৎস আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ফলে এসব দেশগুলোতেও সেসব কুৎসিত সামাজিক ব্যাধি দেখা যেতে শুরু করেছে—যার যন্ত্রণায় গোটা পাশ্চাত্য সমাজ ত্রাহি ত্রাহি-চিৎকার তুলছে। আমাদের সমাজেও যদি পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ অব্যাহত থাকে তাহলে আমরাও যে পাশ্চাত্যের মতো কঠিন সমস্যাবলির জটিলতায় জড়িয়ে পড়বো তাতে সন্দেহ কি?

আমরা এখানে বাস্তব ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের চাকুরী সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই এবং এটাও দেখিয়ে দিতে চাই যে—

আধুনিক সমস্যাসমূহের মূল কারণ কি এবং পাশ্চাত্য সমাজে এর কি মারাত্মক কুফল দেখা দিয়েছে।

এ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার গোড়াতেই আমরা পাশ্চাত্যের অন্ধানুসারী তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতাদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে—আজ সেই কোন্ সমস্যাটা দেখা দিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের চাকুরী করাটা এতবেশী জরুরী মনে করা হচ্ছে? অথচ এর আগে এমন কোন সমস্যা ছিল না। তাহলে, হঠাৎ করে এরা কেন এত চেচাঁমেচি শুরু করে দিচ্ছেন যে, মহিলাদেরকে তাদের আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চাকুরীর জন্যে বেরিয়ে পড়তে হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে তাঁরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জবাব ও যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেন—

(ক)—চাকুরী-বাকরীর ফলে মহিলাদের চিন্তা ও মানসিকতা সম্প্রসারিত হয়, তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে এবং সে ধৈর্যসাপেক্ষ একাকীত্বের বিরক্তি থেকে রক্ষা পায়। চাকরী না করলে সে ঘরের চারদেয়ালের অভ্যন্তরে দলবদ্ধ হয়ে মারা পড়তো।

(খ)—কোন জাতির উন্নতির চাবীকাঠি হচ্ছে এই যে তার মধ্যে কর্মক্ষমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু মহিলা জনগণের অর্ধেকাংশ, সুতরাং তাদেরকে যদি আমরা জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায় শামিল না করি তাহলে যথার্থভাবে আমরা উন্নত হতে পারবো না।

(গ)—তৃতীয় উপকার এই যে এতে করে সে নিজ দায়িত্বশীলের সহায়তা করতে পারে। এবং যদি তার কোন দায়িত্বশীল নাও থাকে তাহলে অন্ততঃ সে নিজেই নিজের ভরণপোষণের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। এমনও হতে পারে যে সে বিধবা এবং ছোট ছেলেমেয়েদের লালনপালনের দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয় এক্ষেত্রেও নিজের এবং সন্তানদের ভরণপোষণের জন্যে

তাকে চাকুরীর জন্যে বাইরে বেরুতে হয়। এছাড়া একজন মানুষ হিসাবে তারও কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে; এই জন্যে তার একটা নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ যাতে সে আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে। এবং কারো উপর বোঝা হয়ে থেকে নিজ আত্মমর্যাদা রাখার তাগিদে আয় উপার্জনের জন্যে তাকে বাইরে বেরুতে হয়।

এই হ'ল মহিলাদের চাকুরীকরণ সমর্থকদের যুক্তি। এখন আসুন! আমরা ঐসব যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে দেখি যে এসব যুক্তির ওজন ও গুরুত্ব কতটুকু। এসব কথা ও যুক্তি কতটুকু খাঁটি কতটুকু মেকী তাও স্পষ্ট করা দরকার। আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা সব রকমের বৈষম্য বা পক্ষপাতের উর্দ্ধে উঠে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং বাস্তব দৃষ্টি-কোণ থেকে তাদের কথাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করবো। আমরা কোরানী যুক্তি-প্রমাণ এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই আলোচনা পেশ করবো।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

বাইরে বের হলে যে নারীর চিন্তা ও মানসিকতায় ব্যাপকতা আসে তা সঠিক, এ ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। মহিলারা চিন্তা ও মানসিকতার ক্ষেত্রে আরো বেশী মহৎ ও উন্নত হোক—আমরা তা কামনা করি।

কিন্তু যাঁরা একথা পেশ করছেন আসলে তাঁদের যুক্তির বুনিয়াদ হচ্ছে দূর অতীতের অন্ধকার সমাজ-যার প্রভাব এখনো কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অথচ এর কারণ হচ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং নীতি-নৈতিকতা ভদ্রতা-সভ্যতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের চরম উদাসীনতা। এই কারণেই তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও আচার-ব্যবহারে উন্নতি হয়নি। তারা জীবনের মূল্যবোধ এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত রয়েছে। একই কারণে তারা ঘরে বাইরের যেকোন ক্ষেত্রে যেকোন কাজে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে

ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার ফলেই তাদের জীবন সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদতার শিকারে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা এতো অধঃপতিত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের গুরুত্ব ও মর্যাদাও তারা ভুলে বসেছে। আজ তারা মূর্খতার কারণে এটা মনে করে বসেছে যে—গৃহস্থালির কাজকর্ম করা এবং সন্তান প্রসব ছাড়া যেন তাদের আর কোন দায়িত্বই নেই। ইসলাম তাদেরকে যে মহৎ ও মহান উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করেছিল—মূর্খতা-বশত আজ তারা সেই দিক ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবে তাদের মনমানসিকতা অবনতি ও অন্ধতার অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

আমরা ইতিপূর্বের এক আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে দাম্পত্য সম্পর্কের যৌন দিকটাই মুখ্য নয় বরং তার আধ্যাত্মিক সম্পর্কটাই হ'ল তার মুখ্য বিষয়। এই আধ্যাত্মিকতার ফসল হচ্ছে প্রেমপ্রীতি-দয়া-দাক্ষিণ্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষা, এর চেয়েও বড় ফসল হিসেবে পরিলক্ষিত হয় গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ পান করানো ইত্যাদি। এসব আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই আল্লাহ তার সন্তানকে এক আধ্যাত্মিক জীবন দান করেন। ফলে সন্তান পিতামাতার অনুগত ও ভক্ত থাকে, পিতামাতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এরপর সন্তান সঠিক পথে জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হয়ে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিকতা যার মাধ্যমে সন্তান বড় হয়ে পিতামাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাদের সেবা করে সন্তুষ্ট হয়। আর এটাই হচ্ছে সেই ভিত্তি যার উপর আমাদের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক মজবুত ও স্থিতিশীলতা অর্জন করে। আমরা ইতিপূর্বে এটাও বলেছি যে দাম্পত্য বিধি এবং সন্তান ও পিতামাতার মধ্যেকার সম্পর্কের উপকারিতা কেবল তখনই অর্জিত হবে যখন শর্তাবলী পূরণ করা হবে। (এসব শর্তাবলী সম্পর্কে আমরা বক্ষমান গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দরকারবশতঃ তা পুনঃ অধ্যয়নের অনুরোধ করবো।)

আমরা এটাও বলেছি যে, জ্ঞানার্জন নারীদের জন্য কেবল এক অধিকারই নয় বরং অন্যতম ফরযও, এবং তাদেরকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ-সুবিধা

সরবরাহ করাটা পরিবার তথা গোটা সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর তারা সেই শিক্ষা অর্জন করবে যাতে তাদের মনে উদারতা এবং বিবেক-বুদ্ধিতে আলোকসম্পাত ঘটবে, জীবনের সাধারণ বিষয়াবলিতে ভদ্রতা ও সততার স্ফুরণ ঘটবে, দাম্পত্য সম্পর্কের আধ্যাত্মিক ও সামষ্টিক উপকারিতা সম্পর্কে বোধোদয় ঘটবে এবং এর জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজ ও সরকারের মৌলিক কর্তব্য। নারী জাতি যাতে সামগ্রিকভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নিজ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে তাদের ব্যক্তিত্বে যাতে পূর্ণ মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে, যাতে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেজন্যে তাদেরকে পুরোপুরি অবকাশ দিতে হবে।

আর এসব শর্ত পূরণের জন্যে ইসলাম নারীকে যেসব গুণাবলিতে ভূষিত দেখতে চায় সেসব বিষয়াদি সম্পর্কে আমরা আগেই ইঙ্গিত করেছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলিম মহিলাদের যদি ইসলামের নির্দেশিত পন্থা মোতাবেক অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ দেয়া হয় তাহলে আজকের মুসলিম নারী যথার্থ অর্থে দুনিয়াতে আদর্শ নারীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসন লাভ করতে পারে। ইসলামী শিক্ষা ও শর্ত অনুসরণ করে তারা দুনিয়ার অন্যান্য বিভ্রান্ত ও অধিকার বঞ্চিত নারীদের সামনে সত্যিকারের স্বাধীন ও মর্যাদাপ্রাপ্তা নারীর উজ্জলতম দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে।

ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই নারী তার নারীত্বের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এভাবেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বকীয় স্বাতন্ত্র ও ক্ষমতার প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং তারা ঘরে ও বাইরের জগতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের বাস্তব উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

সুতরাং আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আমরা যদি সত্যিসত্যিই নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে চাই, তার মনে উদারতা আনতে চাই, চাই যদি তাকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে টেনে আনতে, যদি তাকে

জীবনের প্রকৃত প্রস্তুতি পথে তুলে ধরতে চাই তাহলে ইসলামের চিরন্তন সজীব নীতির অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই। আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার লাঞ্ছিতা-বঞ্চিতা নারী জাতিকে সত্যিকারের সম্মান স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়ার স্বপ্ন কেবল তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ করবো। বস্তুতঃ আমাদের পূর্বসূরী সংস্কারক ও চিন্তাধারা এই স্বপ্নই দেখে গেছেন।

তবে হ্যাঁ, নারী তার ঘরদোর ছেড়ে কলকারখানায়, ব্যাংকে, আর এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করুক এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তিই কামনা করতে পারে না। তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে তাদেরই স্বভাবের আলোকে। সেখানে পুরুষের অবস্থা দিয়ে নারীদের ব্যবস্থা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আর ইসলাম যেহেতু নারীর মর্যাদা ও স্বভাবের অনুকূলে থেকে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার নিশ্চিত উপায় দেখিয়ে দিচেছ তাই তার অনুসরণ করা সাফল্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিৎ। এছাড়া অন্যান্য উপায় ও ব্যবস্থা নারীকে তার স্বভাবের গণ্ডি থেকে জোরজবরদস্তি টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও আধুনিক মতবাদগুলোর মধ্যে শুধু ইসলামই নারীর জন্যে জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষা-দীক্ষায় নীতিতে, চরিত্রে, বিবেকবুদ্ধিতে সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য বা ব্যবস্থা নেই। এই বাস্তবতা সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

ইসলামী সমাজে সংস্কারমূলক তৎপরতায় অংশ নেয়ার পুরো অধিকারই নারীর রয়েছে। ইসলামী সমাজের নারী বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সমালোচনা এবং পরামর্শ দিতে পারে এবং যে কোন সামাজিক, সংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক সংগঠনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হবে।

এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা তাকে জীবনের মহত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে; তার ব্যক্তিত্বকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করে, সে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝে নিতে পারে। বস্তুতঃ ইসলামী শিক্ষা তার মন ও চিন্তাকে করে উদার ও সম্প্রসারিত। এর মাধ্যমে নারী পরিণত হয় আদর্শ নারীতে। কলকারখানায় আর পথে ঘাটে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে নারী তার এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

বলুতো, কলকারখানায় লোহালক্কড় টানাটানি করে, দোকানে সেলস্ গার্ল হিসেবে সওদাপতির মোড়ক বেধে নোংরা ফ্যাশন বিলাসিতায় পড়ে উত্তেজক পোষাক পরে পথে-গাটে অঙ্গপ্রদর্শনী করে বেড়ালে, সিনেমা-থিয়েটারে-ক্লাবে অসৎ পুরুষদের ভোগ ও খেলার পাত্রী হয়ে থাকার মাধ্যমে কি নারী তার অধিকার বা মর্যাদা অর্জন করতে পারে?—বলুন, এসব অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত পথে চলে নারী কি আজ পর্যন্ত তার কোন লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? ভোগ বিলাসী পুরুষদের অবৈধ আনন্দের মাধ্যম আর পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন সেজে নারী কি যথার্থ মুক্তি পেয়েছে? আর এসব পংকিল ও ঘৃণ্য পথে ছেড়ে দিয়ে কি নারীরা আলোকপ্রাপ্ত ও উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমরা আশা করতে পারি? এভাবে কখনো কি তাদের সমস্যার কোন সমাধান হবে?

আসলে নারী যদি তার স্বামীর গৃহ-পরিবারের কর্ত্রী, তার সার সম্পত্তির রক্ষাকারিণী, তার বিষয়াবলির তত্ত্বাবধায়িকা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ও মাতৃত্বের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে আন্তরিকভাবে যত্নশীল হয় এবং তার সব জ্ঞান বুদ্ধি ও সময় যদি এসব দিতেই মনযোগী হয় তাহলে নারীর কল্যাণ আশা করা যেতে পারে। হতে পারে আমাদের এই অভিমতের সাথে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করবেন। হয়তো মনে করতে পারেন যে এটা শুধু আমাদেরই মতামত। কিন্তু না, আমাদেরই একথা নয়। বরং আধুনিকতার স্বর্গরাজ্য আমেরিকার এক আধুনিকা মহিলারই একটি অভিমতও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে যা বলেছেন তাকে "নারী বারোধী" বা "প্রতিক্রিয়াশীলতা" বলে উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই।

তিনি শুধু একজন মার্কিন আধুনিকাই নন বরং বিখ্যাত সাহিত্যিকাও। তাঁর নাম ফিলুস মাকজেনিলী। তিনি "নারী গৃহের সম্রাজ্ঞী" নামক শীর্ষক পুস্তকের এক প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা প্রশ্ন ও জবাবসহ শুনুন।

প্রশ্ন হচ্ছে—"আমাদের নারীদের মুক্তির চরম পর্যায়ে পেঁৗছানোর পর এখন কি ওখান থেকে ফিরে আসা উচিৎ? আর যদি এখন আমরা আবার ঘরে ফিরে চলি তাহলে সেটা আমাদের অস্তিত্বের সাথে অবিচার হবে না?

এর জবাবে ফিলুস মাকজেনিলী বলেন "আমি এই সমস্যা সম্পর্কে একটি মজবুত অভিমত পোষণ করি এবং আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, গৃহের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকার অধিকার নারীর রয়েছে। আমি তার গুরুত্ব মর্যাদা অনুমান করতে পারি যা নারী মানবতার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যে আদায় করে থাকে এবং আমি তাকে মানব জীবন ও তার উন্নতির জন্যে পর্যাপ্ত মনে করি।" (মার্চ : ১৯৬০)

মার্কিন আধুনিকাদের এই প্রতিনিধি সাহিত্যিকের মতামতে তাঁর নারীত্ব উপলব্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন—"আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো?" এ প্রশ্ন শোনার পর তিনি বলেন "আমি সেই গুরুত্বের অনুমান করতে পারি যা সে মানবতার কল্যাণের জন্যে করে থাকেন।"

এসব কথা বলছেন অন্য কেউ না—স্বয়ং পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিনিধি একজন আমেরিকান মহিলা যেখানে মেয়েদের ঘরের বাইরে এখানে-ওখানে চাকরীবাকরী করা একটা সাধারণ ব্যাপার। এই জন্যে তাঁর কথায় অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার স্বরূপ স্পষ্ট। সুতরাং তিনি যখন বলেছেন যে "মানব ও তার আসল উন্নতির জন্যে নারীর পক্ষে গৃহের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরী।" তাঁর এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার এই স্বীকৃতি ও সমর্থনের পর এই সমস্যা নিয়ে আরো দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ থাকে না। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সমাজের উন্নতি এবং জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে নারীকে সংস্কারমূলক এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা উচিৎ। কিন্তু এর জন্যে প্রথম শর্ত

হচ্ছে সে এর জন্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলবে। এটা নারীর চিন্তা ও মানসিক অগ্রগতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাতির উন্নতি

আর এই কথা যে, জাতির উন্নতির চাবিকাঠি কর্মশীল লোকদের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু নারী জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ তাই তাকে জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না দিলে যথার্থ উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়। আমাদের মতে এটাও ঠিক কথা। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে জাতীয় উন্নতির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে তার আকিদা বিশ্বাস, চরিত্রনীতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আর উন্নতির অন্য দিকটি হচ্ছে বৈষয়িক যাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে জাতি এই উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করবে প্রকৃতপক্ষে তাকেই কেবল উন্নত জাতি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেই জাতির লোক সৎ ও সাহসী হবে; তাদের উদ্দেশ্য হবে মহৎ এবং তাদের থাকবে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার মত জ্ঞান ও দক্ষতা। এটা সেই মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য যা যে কোন জাতির উন্নতির জন্যে অপরিহার্য।

ইসলাম এসব গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যের উপরই সত্যিকারের উন্নত জাতি গঠনের নিশ্চয়তা বিধান করে। অর্থাৎ শুধু একমাত্র উন্নতিকে উন্নতি বলা যাবে না। যেমন কেবল বৈষয়িক উন্নতিই যথেষ্ট নয়—তার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতিও অপরিহার্য। এই জন্যেই ইসলামকে মানবতার জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ বলা হয়। ইসলাম যেমন একদিকে বলে যে,

"তোমাদের শক্তি মোতাবেক আল্লাহকে ভয় কর।" (আলকোরান)

তেমনি অন্যদিকে বলা হচ্ছে—

"এবং যতটুকু সম্ভব সাধ্যমত বেশী থেকে বেশী শক্তি সঞ্চয় কর।"
(আল্ কোরান)

অর্থাৎ সব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে,—কোথাও সীমা লংঘন করবে না এবং তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র এবং একটি স্থায়ী সামরিক বাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকবে যেন শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে সময়মত সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এবং নিজেদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়কেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলাম নারী ও পুরুষকে সামাজিক; রাজনৈতিক ও সংস্কারমূলক ক্ষেত্রে বরাবর দায়িত্ব সোপর্দ করেছে এবং তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে উভয়কে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের গন্ডিতে থেকে। জ্ঞান বুদ্ধি ও স্বাভাবের তাগিদও এটাই। পুরুষের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পরিবার পরিজনের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা শামিল রয়েছে আর নারীর স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে ঘর ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনার তত্বাবধান করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কাজ যথেষ্ট মুশকিল বটে, কিন্তু ফলাফলের দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং পবিত্রতর। এছাড়া প্রাকৃতিকভাবেও নারীর উপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, যেমন গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং সন্তানের প্রশিক্ষণ দান নারীরই দায়িত্ব। স্বামীকে ভালবাসা দেয়া, তার সেবা করা, সন্তানকে মাতৃস্নেহ দান করা ইত্যাদিও নারীর দায়িত্ব। বৈষয়িক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে স্নেহ ভালবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করাও নারীরই স্বভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব দায়িত্ব নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এব খুবই অর্থবহ। এসব দায়িত্ব পালনে নারীকে তার সব জ্ঞানবুদ্ধি, প্রতিভা দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে ব্যবহারাধীনে আনতে হয়।

নারীর স্বভাব-প্রকৃতি মোতাবেক তার ক্ষমতা ও আগ্রহকে সামনে রেখে আল্লাহতায়ালা তাদের উপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নারীর এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্যেই সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করছে। উপরে বর্ণিত দায়িত্ব সুষ্টুভাবে পালন করেই নারী তার অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোন একটি ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় তাহলে সমাজ তথা জাতীয় উন্নতি বিঘ্নিত হয়ে

পড়বে এবং নারী যখন তার আসল দায়িত্ব অবহেলা করে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তখন সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিভিন্ন জটিল সমস্যা দেখা দেয় আর এরই পরিণতিতে নারী নির্যাতন, অশ্লীলতা, ব্যাভিচার ও বেকারত্বের মতো মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। কারণ জনগণের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশই যদি তাদের নিজ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অপর পঞ্চাশ ভাগের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

জাতির উন্নতির জন্যে অধিকাংশ লোকের কর্মশীলতা সংক্রান্ত আপত্তির জবাব আমরা উত্তরে দিয়েছি। কিন্তু কোন কোন লোক অজ্ঞতা বশতঃ মনে করেন ইসলামী সমাজে নারীরা একটি অবশ অংগের মতই হয়ে থাকে এবং পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে তার ভূমিকা পালনের কোন অবকাশ থাকেনা। তারা আবার এটাও মনে করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নারী কলকারখানায়, অফিসে আদালতে, অর্থাৎ বাইরের কোন কাজের মাধ্যমে আয় উপার্জন করে না ততক্ষণ পর্যন্ত নারীকে কর্মী বলা যাবে না। অর্থাৎ বাইরে না বেরুলেই সে বেকার বলে গণ্য হবে।

হতে পারে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় তাদের কথাই ঠিক। সম্ভবত এধরনের লোকেরা পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করতে গিয়েই এসব কথা বলে থাকেন। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে জীবনের উদ্দেশ্য, নিজের প্রকৃতি এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত থাকাটাই হচ্ছে নারীর আসল অজ্ঞতা? তার সবচেয়ে বড় মূর্খতা এই হবে যে সে তার পরিবার ও পরিবেশকে সুন্দর ও সুশৃংখল রাখতে জানবে না, কিভাবে স্বামীর সাথে মিলশিম রেখে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে—তা জানবে না। এটা হবে নারীর সবচেয়ে বড় অযোগ্যতার পরিচয়।

পাশ্চাত্যের অনুসরণে মুক্তির স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়নরা এটাও মনে করেন যে ঘরদোরের সীমানায় কর্মশীল নারীর কোন মান মর্যাদা থাকে না; ঘরে থাকে বলে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না। কিন্তু এরাই যখন বাইরে বের

হয় তখন নাকি সমাজের বিরাট উন্নতিও অগ্রগতি অর্জিত হয় তা সে কোন কাজ করুক বা না করুক। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলাদের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানোটাই প্রগতির ইঙ্গিত। আজব কথাই বটে। —কিন্তু এসম্পর্কে আমাদের অভিমতকে নীচে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

(১)—বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আদর্শের অনুসরণে নারী যখন শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করবে, নিজের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতি অর্জন ক'রে নিজেদের কর্মসীমায় ওসব দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করবে তখন তাদেরকে কোন অর্থেই বেকার বলা যাবে না। আমরা আগেই বলেছি যে সমাজের যথার্থ উন্নতির জন্যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতিই দরকার। এর মধ্যে পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে আয় উপার্জন করা আর পরিবার পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা এবং এখানেই নারী ও পুরুষের নিজ নিজ কর্মসীমা বিভক্ত হয়ে পড়ে। মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির স্বার্থে এই স্বাভাবিক বিভক্তি একান্তই অপরিহার্য। বলা বাহুল্য নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কর্মরত কোন নারী বা পুরুষকে কোন অর্থেই বেকার বলা যেতে পারে না। তদুপরি আমরা যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের কর্মক্ষেত্রে আনীত দায়িত্বসমূহের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, পুরুষের তুলনায় নারীর দায়িত্বটাই অধিকতর কঠিন ও ধৈর্য্যসাপেক্ষ। এছাড়া নারীর কাজ পুরুষের কাজের তুলনায় অধিকতর আন্তরিকতা ও মহৎ মননশীলতার দাবীদার।

(২)—আর যদি কেউ বলে যে, গৃহস্থালী কাজকর্মের সম্পাদন, স্বামীর সেবা, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ খাওয়ানো, তাদেরকে উপযুক্ত মানুষ ও তথা সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজ কোন কাজই নয় এবং এসব কাজকর্মের কোন মূল্য বা গুরুত্বই নেই,—তাহলে এধরনের অভিমত পোষণকারী ব্যক্তিকে অন্ধ-বধীর ও অসুস্থ বিবেকধারী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

নারী তাদের নিজ কর্মকে দৈনন্দিন জীবনে অতি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে যেসব কাজকর্ম ক'রে থাকে, ধরে নিন, সেসব কাজ যদি পুরুষকে পালন করতে বলা

হয় তাহলে সেখানে শতকরা একশ'জন পুরুষই অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে। এরপর এসব লোকেরা যারা নারীদের কর্মকে বড্ড তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করে তাদের বোধোদয় ঘটবে যে, নিজকর্মক্ষেত্রে নারীর গুরুত্ব কতো বেশী।—মনে করুন নারী যদি তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অর্থাৎ ঘরদোরের তত্ত্বাবধান, সাংসারিক সৌন্দর্য ও শৃংখলা কায়েম, স্বামীকে সেবা, সহযোগিতা ও ভালবাসা দান, সন্তানের লালনপালন ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দান, আদর স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে পুরুষের মতো কলকারখানা আর পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ? বলুনতো, এমতাবস্থায় পারিবারিক সামাজিক সুখশান্তি ও নিঃস্বার্থ প্রীতি ভালবাসার কোন অস্তিত্ব থাকবে কি ? আজকের ইউরোপ আমেরিকায় এতো বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি সত্বেও তারা অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহমমতা আর নিঃস্বার্থ সেবা থেকে বঞ্চিত। পাশ্চাত্য সমাজ পারস্পরিক সম্প্রীতি আর সহানুভূতির পবিত্র অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। তাদের বড় বড় ঘরবাড়ি মোটরগাড়ী বিলাসব্যসনের অঢেল আয়োজন আর কোটি কোটি টাকা থাকা সত্বেও তারা আজ বড্ড অসহায় অশান্ত-অতৃপ্ত। আজ তারা বৈষয়িক উন্নতির শীর্ষস্থানে পেঁাচেছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে আস্থা-বিশ্বাস ও ভালবাসা নেই, মাতাপিতা ও সন্তানদের মধ্যে স্নেহভালবাসার সম্পর্ক নেই, ভাইবোনের মধ্যে পবিত্র অনুভূতির কোন বন্ধন নেই—মোট কথা তারা পারস্পরিক ভাল-বাসা-সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, দয়া মায়া ইত্যাদি অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। সব কিছু থেকেও তাদের যেন কিছুই নেই।

খোদা না করুন আমাদের সমাজে যেন সেই অভিশপ্ত পরিণতি না নেমে আসে। আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন ক'রে পাশ্চাত্যবাসী আজ যেসব মারাত্মক ও আত্মঘাতী সমস্যায় জর্জরিত মুসলমানরা যেন সেই-ভুল না করে বসে। আল্লার ইবাদাত, ঈমান, ভক্তি ভালবাসা স্নেহ মমতা সহানুভূতি ইত্যাদি এমন আধ্যাত্মিক সম্পদ যার এক একটির মোকাবিলায় সারা দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদই একান্ত তুচ্ছ। যারা এই আধ্যাত্মিক সম্পদকে বাদ দিয়ে পার্থিব স্বার্থের পিছনে দৌড়াচ্ছে—তারা সত্যিই বড় হতভাগ্য লোক।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমরা একথা স্বীকার করি যে বাহিরের যে কোন কাজ করার ক্ষমতা এবং যোগ্যতাও নারীর রয়েছে। নারী চাইলে ঘরের এবং বাহিরের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে পারে। অর্থাৎ বাহিরে পুরুষরা যেসব কর্ম করে নারী সেসব কাজও করতে পারে আবার পুরুষের পক্ষে যে কর্ম কোন দিনও সম্ভব নয় সে কাজও নারীই করে যেমন গর্ভধারণ, প্রসব ও দুধ খাওয়ানো এবং সন্তানের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো নারী নিজ ক্ষেত্রের এতসব গুরুদায়িত্ব পালনের পর আবার পুরুষের দায়িত্ব ও নিজের কাঁধে নেবে কেন? যারা নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে ব'লে তারা কি নারীর উপর অবিচার করছে না? পুরুষ যখন নারী-সুলভ কোন কাজ করে না এবং করতে পারে না তখন নারীকে পুরুষের কাজ করার জন্যে বাধ্য করা হবে কোন যুক্তিতে? নারী পুরুষের কাজও করতে পারে, তাই বলে কি তাকে উভয় দায়িত্বই চাপিয়ে দেয়া হবে? নারী যদি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহলে তার নিজ ক্ষেত্রের কাজ কি ব্যাহত হবে না? আর তদুপরি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নারী যে দায়িত্ব পালন করে তাকে কি তার যোগ্য পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দেয়া হয়? বাহিরের কর্মক্ষেত্রে নারীর উপর যে জুলুম অবিচার ও অসমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ না হয় এখানে বাদই দিলাম। কিন্তু এটা তো বাস্তব সত্য কথা যে একই ক্ষেত্রে একই কাজ করার পরও কোন নারীকে পুরুষের সক্ষম পারিশ্রমিক এবং মর্যাদা দেয়া হয় না। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে যে নারীর উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় তা তাদের বেতন ও পারিশ্রমিকের অসম ব্যবস্থা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নারী যে শোষিতা, বঞ্চিতা ও মানহীনা হবে তাতো জানা কথাই। অন্যদিকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীকে স্থান দিয়ে পুরুষ তাকে অনুকম্পা বা দয়া প্রদর্শন করছে বলেই মনে করে এবং এই অপ্রয়োজনীয় অনুকম্পার বিনিময়ে নারীর নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও সেসবপুরুষেরা পিছিয়ে থাকে না।

আমাদের অভিযোগ—কর্তারা এটাও বলে থাকেন যে, "নারীর পক্ষে ঘরের ভেতরে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাথে কাজ করা সম্ভব?" এভাবে তাঁরা একথারই স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে নারীর ঘরের সীমানাও কাজকর্ম করে,—

বেকার বসে থাকে না। সুতরাং ঘরের সীমাতে অবস্থানরতা মহিলাদের ব্যাপারে তারা যে কর্মহীনতা বা বেকারত্বের অপবাদ দিয়ে থাকে তা তাদের নিজেদের মতামতকে খন্ডন করে এবং তাদের গোটা চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করে।

কিন্তু তারা যে বলেছেন নারী ঘরের ভেতরে ও বাইরে একই সাথে সব কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করতে সক্ষম, তা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যেমন মনে করুন নারীর এক দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর সেবা করা এবং তাকে স্বস্তি দেয়া। এজন্যে তার মধ্যে সব সময় স্বামী ভক্তি ও স্বামী প্রেমের মধুর অনুভূতি থাকা স্বাভাবিক প্রয়োজন আর স্বামীর সেবার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। যেমন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে একথা বলতে পারে না যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তুমি আমার স্ত্রী হিসেবে সেবার দায়িত্ব পালন কর, এরপর তোমার ছুটি, যেখানে ইচ্ছা যাও, যা মর্জি তা কর।" এভাবে কোন মা তার সন্তানদের পুরোপুরি চাকর বাকরদের হাতে ছেড়ে রাখতে পারে না। তারা তার সন্তানকে মায়ের মতো আদর-স্নেহ করার পরিবর্তে লুকিয়ে ছাপিয়ে মারধোর করবে এবং মায়ের বদলে অন্য কারো পক্ষে সন্তানের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও দেয়া সম্ভব নয়। কোন চাকর বা আয়া শিশুকে একথা বলবে কি যে, আদর সোহাগের জন্যে তোমাদের মায়ের অপেক্ষায় থাক? এবং মা তার শিশু সন্তান বা স্বামীর সেবা বা অন্য কোন দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কি কল-কারখানায় দৌড়াবে? কিংবা সন্তানের দেখাশুনা এবং বাহিরের চাকরী একই সাথে করতে থাকবে? এমতাবস্থায় উভয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন সম্ভব কি? এক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্য দায়িত্বকে শিকেয় তুলে রাখবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে দুদিক দেখতে গিয়ে কোন দিক সামলানোই আর হয়ে উঠে না। ফলে একূল ওকূল দুকুলই হারায়।

তা সত্ত্বেও, আমরা তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্যে যদি তাদের কথা মেনেও নিই যে, নারী তার সময়কে উভয় ক্ষেত্রের কাজের জন্যে বন্টন করে নেবে। তাহলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে? এর ফলাফল কি এই দাঁড়াবে যে সে তার সীমিত সময়ে নিজের সীমিত ক্ষমতার প্রয়োগ করে যে কাজ করবে তা পুরুষের তুলনায় কম এবং অপূর্ণাঙ্গ হবে। যেমন আগে বলেছি, সে কোন

ক্ষেত্রের কাজের সাথেই সুবিচার করতে পারবে না। তা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় একই ব্যক্তির দুনৌকাতে সফর করা।

তাহলে কথা দাঁড়ালো এই যে, ঘরে বাহিরের উভয়ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে যেভাবে তার ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে তেমনি তা থেকে কোন বৈষয়িক উপকার অর্জনও করা যাবেনা।।

বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কি হবে? ঘরে বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করার ফলে আধ্যাত্মিকভাবে তার যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা কি দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দিয়েও পূরণ করা যাবে? আমেরিকার আধুনিকাদের প্রতিনিধি সেই সাহিত্যিকা এফ, ম্যাকজেনিলী এ সম্পর্কে বলেন,—"যদি আমাদেরকে অন্যায়ভাবে একাজের জন্যে বাধ্য করা হয় যে, আমরা ঘরবাড়ী ছেড়ে গিয়ে বাহিরে বের হয়ে কাজ করবো তাহলে এটা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ ও যুক্তিহীন বলা হবে। কারণ, বাহিরের কোন কাজ এতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তার জন্যে পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা তছনছ করে দেয়া হবে।"

এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উভয়ক্ষেত্রের কাজের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা একান্তই নিরর্থক এবং বিভ্রান্তিকর। এভাবে তাদের এই দ্বিতীয় আপত্তিও খণ্ডিত হয়ে যায়।

এরপর আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একথা যাচাই করে দেখি যে নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে কাদের কাজ রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাহলে বাস্তবতার আলোকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হ'ব যে নারীর কর্মই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা ঠিক। কিন্তু নারীর কাজ তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি ঘরে বাড়ীতে পুরুষের অর্জিত আয়ের সংরক্ষণ ও হেফাজত না করে এবং তার সন্তানদের দেখাশুনা ও প্রশিক্ষণ না দেয় তাহলে পুরুষের আয় উপার্জনের কোন অর্থই দাঁড়াবে না। আসলে ভবিষ্যত বংশধর তথা জাতির ভিত্তি রচনা করে নারীই। একজন আদর্শ নাগরিক আর কর্মঠ ব্যক্তি মৌলিক প্রশিক্ষণ অর্জন করে মায়ের কাছ থেকেই। ছেলে মেয়েকে সৎ শিক্ষিত ও ভদ্রতার

কাঠামোতে গড়ে তোলেন মায়েরাই। পুরুষতো কেবল দুপয়সা কামিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। কিন্তু পুরুষের কামানো সেই আয়কে বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করে নারীই। সব চিন্তাভাবনা তৈরী করতে হয় তাদেরকেই। এখন আপনারাই বলুন, সমাজ ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাদের কাজের গুরুত্ব বেশী? যারা বলেন, যে শুধু পুরুষই কাজ করে আর নারী বেকার বসে বসে খায় তাঁরা আসলে তাদের চরম অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। তারা কোন দিন নারীর কাজের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করেন নি, নইলে নারী সম্পর্কে এমন মূর্খতাপূর্ণ মন্তব্য করা সম্ভব হ'ত না।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের সর্বজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ বার্ণার্ড শ' অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন "প্রাকৃতিকভাবে নারীর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, কোন জাতি তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না এবং এর কোন বিকল্প পেশ করাও সম্ভব নয়। নারী নয় মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের দুঃসহ যাতনা সহ্য করে, এরপর সন্তানের জন্ম দেয় ও তার প্রশিক্ষণদান করে এবং এই জন্যেই সে ঘরবাড়ীর ব্যবস্থাপনার কাজে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এই সেবার জন্যে সে কারো কাছে পারিশ্রমিক চায়ও না। এই কারণেই মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নারীর কাজকে কাজ বলেই মনে করে না। আর যখনই কাজের কথা উল্লেখ করা হয় তখন শুধু পুরুষদের কাজের কথাই বোঝানো হয়। অথচ পুরুষের যাবতীয় মেহনত কেবল জীবিকার অন্বেষণেই সীমিত থাকে এবং তার সব চেষ্টা সাধনার লক্ষ্য কেবল একটি লোভনীয় গ্রাস গ্রহণই হয়ে থাকে। কোন কোন লোক নারীদেরকেও পুরুষের কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু তাতে তাদের চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না। কারণ তা নারীর কর্মক্ষেত্রই নয়। নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর এবং সৃষ্টির আদি থেকেই তাকে এই কাজে মোতায়েন করা হয়েছে, কেননা সমাজকে সজীব ও তার উন্নয়নের জন্যে তা অপরিহার্য:—

অসংখ্য পুরুষ অত্যন্ত মামুলী কাজে তাদের জীবন শেষ করে দেয় এবং তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তারা বলে যে এর মাধ্যমে তারা তাদের নারীদের

ভরণ-পোষণ করে। তাই এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। এই নিয়েই ওদের অহংকার ও বাহাদুরীর অন্ত নেই এবং তারা আসল বাস্তবতা বোঝার চেষ্টাই করে না।" (আল-হেলাল মার্চ-১৯৬৫)

দার্শনিক বার্নার্ড শ' অতি বাস্তব কথারই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছেন। এর সত্যতা সম্পর্কে কোন বিবেকবান ব্যক্তিই সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, এতে করে ওসব অপরিণামদর্শী ও বিভ্রান্ত লোকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটবে যারা বলে থাকে যে—সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্যে নারীকে ঘর ছেড়ে বাহিরে বেরিয়ে আসতে হবে।—এর পর আশা করি তারা সত্য ও বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করবেন।

আত্মনির্ভরশীলতা

নারীদের বাহিরে গিয়ে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করার তৃতীয় যুক্তি ছিল এই যে, এভাবে নারী আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে এবং অন্যের কাঁধের বোঝা হয়ে থাকে না। তাছাড়া তার কোন পৃষ্ঠপোষক না থাকার অবস্থায় সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। এমনও হতে পারে যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে তার স্বামী মারা গেছে এমতাবস্থায় নারী বাহিরে গিয়ে আয় উপার্জন ক'রে নিজের ও সন্তানদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। তাছাড়া মানুষ হিসাবে এমনিতেও তার কিছু চাহিদা থাকতে পারে এবং তার আত্মমর্যাদার দাবী হচ্ছে সে এব্যাপারে কারো দানের দিকে চেয়ে না থেকে নিজের চাহিদা নিজেই পূরণ করবে।"

উপরের কথাগুলোকে আমরা দু'ভাবে পর্যালোচনা করতে পারি। প্রথম—এর একদিক তো হচ্ছে এই যে আমরা দেখবো যে এই যুক্তি আমাদের অবস্থার সাথে মিল খায় কিনা এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে নারী ঘরের বাহিরে চাকুরীর জন্যে বেরুতে পারে কিনা ?

আমরা যখন বাস্তব অবাস্তব পর্যালোচনা করি তখন আমরা এটা দেখতে পাই যে, যে কোন নারী, পল্লীর সেকেলে পরিবেশের হোক বা শহরের শিক্ষিতা

আধুনিকা, জ্ঞানী হোক বা মূর্খ—মা বোন, স্ত্রী নির্বিশেষে যে কোন নারী তাদের পিতা, ভাই ও স্বামীর নির্ভরশীলতায় থাকাকে কোন অবস্থাতেই অবমাননাকর মনে করে না, যে কোন নারী পিতা-ভাই বা স্বামীর নির্ভরশীলতায় জীবন যাপনকে গৌরবজনক বলেই মনে করে। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউ যদি পিতা-ভাই বা স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিতা-অসহায়া হয়ে বাহিরে গিয়ে কাজ করেও থাকে তাহলে এটাকে সে বিরাট অপমান ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারই মনে করে। নারী একান্ত অপারগতার কারণে বা ঘরে চাকরী করতে বাধ্য হলেও এটাকে সে সব সময় কঠিন এবং অস্বস্তিকর বলেই মনে করে।

আমরা অবশ্য একথা জানি যে আজকের পাশ্চাত্য সমাজে চাকরীহীনা মহিলাদের অপমানজনক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় এবং যেসব মহিলা আত্মনির্ভরশীলা নয় তাদের তুচ্ছ মনে করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই অবস্থা হচ্ছে জড়বাদী অপসভ্যতারই পরিণাম। পাশ্চাত্যের গোটা অবস্থাটাকেই আমরা কৃত্রিমতার অভিশপ্ত ফলশ্রুতি বলে অবহিত করতে পারি। কিন্তু এক দিকে পাশ্চাত্যের নারীদের এমন জটিল ও দুঃসহ অবস্থা সত্বেও অন্যদিকে ইসলামী বিশ্বের মুসলিম নারীরা কিন্তু এসব জটিলতা থেকে এখনো মুক্ত রয়েছে। মুসলিম সমাজে একজন মেয়ে তার পিতার উপর নির্ভরশীলতাকে, এবং বিয়ের পর স্বামীর উপর নির্ভরশীলতাকে নিজের জন্যে গৌরবের বিষয় মনে করে এবং পিতা-ভাই বা স্বামী তাদের মেয়ে বোন বা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনকে নিজেদের নৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এবং অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে সেই দায়িত্ব পালন করে। মুসলিম সমাজে কোন পুরুষ তার স্ত্রী বা বোন কিংবা মেয়ে বা মাকে নিজের উপর কক্ষনো বোঝা মনে করে না এবং পিতা-ভাই-স্বামী বা ছেলের উপর নির্ভরশীলতাকে কোন নারী কখনো নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করে না। এই জন্যে অন্যান্য সমাজের মতো মুসলিম সমাজের নারীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সন্তুষ্ট। মুসলিম সমাজের কোন মেয়ে বা মহিলাকে চরম অবস্থায়ও বাহিরে চাকুরীর জন্যে ঘুরে বেড়াবার কথা চিন্তা করতে হয় না। কারণ একান্ত বিপদের অবস্থায় তার কোন না কোন নিকটাত্মীয় স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং মুসলিম সমাজের কোন মেয়ে বা মহিলা বাইরের চাকরী নিজেদের জন্যে চরম অবমাননাকর বলেই মনে করে।

—এভাবে অন্যান্য সমাজের মহিলারাও যদি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করে তাহলে তাদের সমস্যাবলীরও সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে।

দ্বিতীয়ঃ এর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই যে, অন্যদের অবস্থা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করবো। আমরা যখন আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজের পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখে অবাক হই যে সেখানে পিতা মেয়ের প্রতি স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়ানোর প্রয়োজন মনে করেনা। তারা স্বার্থপরতার এতো নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে গেছে যে, সেখানে বাপ ও মেয়ে, ভাই ও বোন এবং মা ও ছেলের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতম ও পবিত্র সম্পর্কের বিন্দুমাত্র গুরুত্বও নেই। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভোগ-বিলাস আর ফ্যাশান প্রদর্শনী নিয়েই ব্যস্ত। মা, বোন, স্ত্রী বা অন্য কারো ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। পাশ্চাত্যের প্রতিটি নর-নারী ব্যক্তিস্বার্থ আর ব্যক্তিগত আয়েশ আরামের চিন্তাতেই অস্থির; অন্য কেউ মরলো কি বাঁচলো সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। যেহেতু সেখানে ইসলামী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের কোন স্থান নেই, তাই, তারা নিরেট যান্ত্রিকতার শিকারে পরিণত হয়ে মহত্তম মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ফলে গোটা পাশ্চাত্য সমাজ আজ চরম স্বার্থপরতা ও বিদঘুটে মেকীপনার সয়লাবে ডুবে মরছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজে নারীর মর্যাদার মান হচ্ছে এই যে, সে বাপ ভাই বা স্বামী কারো ভরণ-পোষণ গ্রহণ করবেনা বরং নিজের জীবিকা সংস্থান নিজেই করবে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের নারীরা তারা স্বাভাবিক দায়িত্ব যেমন গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব তাদের দুধ খাওয়ানো এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গৃহস্থালী দায়িত্ব বর্জনে বাধ্য। কারণ এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার নিজের জন্যে জীবিকার সংস্থান করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের চাকুরীর পক্ষাবলম্বীরা গৃহস্থালীর কাজকে কাজ বলে স্বীকার করতে চায়না। কারণ তাদের মতে গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুধ খাওয়ানোর জন্যে তো আর পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে না। অতএব, যে কাজে টাকা পাওয়া যায়না সেটা আবার কিসের কাজ। আর যেখানে দুটো পয়সা পাওয়া যায় তা যেমনই হোকনা কেন একটা কাজই বটে। এই হলো গিয়ে এসব একদেশদর্শী আধুনিক যুক্তির বহর। কিন্তু

তাদের এসব কথা যে একান্তই অসম্ভব ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর তা ইউরোপ আমেরিকার সামাজিক অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করছে। এ ধরনের অবাস্তব ও ক্ষতিকর মতামতের অসারতা প্রমাণ করে আমরা বলেছিলাম যে, "অত্যন্ত বাস্তব ও নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনার পর আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমাজ ও জাতীয় যথার্থ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে পুরুষদের কাজের তুলনায় নারীদের গৃহস্থালী কর্মই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। অন্যদিকে পুরুষের কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলতে হয় যে নারীদের গৃহস্থালী কাজ কর্মের যে গুরুত্ব রয়েছে, পুরুষের কাজ কর্মকে ততটা গুরুত্ব দেয়া যেতে পারেনা।" এরপর আমরা বলেছিলাম যে, 'এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বলুন যে, উভয়ের মধ্যে কার জীবনের মূল্য ও উপকারীতা বেশী? কার মান মর্যাদা বেশী? কার কর্ম বেশী মহৎ এবং কার জীবন সবসময় সক্রিয় থাকে?"

আচ্ছা, এরপর এটাও চিন্তা করে দেখুন যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই যদি বেশী টাকা কামানোর কাজেই ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের অর্জিত বিপুল অর্থসম্পদে তাদের লাভটাই কি হবে? বলুনতো, শুধু টাকা আয় করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? টাকার গুরুত্বই বা কি? যে টাকা সুখ শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারে না সে টাকা আয় করে কি হবে?

কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতের ময়লা এই ঠুনকো টাকা পয়সার জন্য নারীকে তার মানমর্যাদা এবং পরিবার ও সমাজের সুখশান্তি ও শৃংখলা বিপন্ন করার জন্যে বাধ্য করা হচ্ছে। আজ টাকার মানদণ্ডে নারীর মান ও মূল্য স্থির করা হচ্ছে। নারী জাতির জন্যে এর চেয়ে অবমাননাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? ওটা শুধু নারী জাতির জন্যে নয় বরং গোটা মানবতার জন্যে মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। মানুষ যদি এতটা স্বার্থপর হয়ে যায় যে নিজের স্ত্রীকেও তার আয়ের অংশ থেকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে। যেখানে মায়া মমতা-স্নেহ প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার সব মানবিক উপলব্ধি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে মানুষ বলে গন্য করার কি যুক্তি থাকবে? বস্তুতঃ আজ পাশ্চাত্যের মানুষ সেই চরম প্রশ্নেরই সম্মুখীন! এমনকি আজ তাদের কাছে "মানবতা" কথাটাই একটা অর্থহীন

পশুর। মানবতা ও পশুত্বের মধ্যেকার কোন ব্যবধানকে মানতেও তারা অপ্রস্তুত। এমতাবস্থায় তাদের কাছে নীতি চরিত্র ও আদর্শের যে কি গুরুত্ব থাকতে পারে, তা সহজেই বুঝা যায়। এটা সত্যি যে আজ পাশ্চাত্যের নর-নারীর কাছে কেবল অর্থ ও স্বার্থ ছাড়া নীতি, চরিত্র ও মূল্যবোধের কোন দাম নেই। এই কারণেই দার্শনিক বার্ণাড শ' তাঁর মন্তব্যে তাদের ভুল ধারণার অপনোদন করেন।

আর যদি একথা বলা হয় যে নারী কেবল অনোন্যপায় অবস্থায় বাইরে বেরুবে যেমন তার দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতা দান বা নিজের পিতৃহীন এতীম সন্তানদের লালন পালন ও ভরনপোষণের স্বার্থে বাইরে চাকরী করতে বেরুবে তাহলে তা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

প্রথমতঃ এই যে সমাজ তার একান্ত দায়িত্ব থেকে উদাসীন রয়েছে যার ফলে সমাজের দরিদ্র অভাবী লোকদের জীবনধারণ মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ অসহায়া নারীদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির আবেগ উপলব্ধি এতোটা কমে গেছে যে যার ফলে নারীকে তার মাসুম সন্তানদের ভরণপোষণের জন্যে বাইরে গিয়ে চাকুরী করতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

এথেকে এটাও বুঝা গেল যে, এ ধরণের কোন কঠিন এবং অনিবার্য অবস্থা ছাড়া নারী ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরী করতে প্রস্তুত নয়। কারণ সে চাকরী করতে শুধু এই জন্যেই বাধ্য হয়ে পড়ে যেহেতু তার কোন সাহায্যকারী বর্তমান থাকেনা, সে কারো সহানুভূতি ও সহযোগিতা পায়না। এবং সমাজ তার দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার পরিচয় দেয়। যদি এই দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে নারীকে বাইরে গিয়ে চাকরী করার কথা ভাবতে হয়না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব সমস্যার মূলে রয়েছে অবক্ষয়মান সামাজিক অবস্থা। সমাজের বর্তমান দোষত্রুটিগুলোর সংশোধন করেই এসব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করা যেতে পারে। এই জন্যে সমাজ সংস্কারের সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ সবরকমের দোষ ত্রুটিও অপরাধ সামাজিক নীতির অবক্ষয় থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সমাজের লোক স্বার্থপর ও মানু-

বিক সহানুভূতি ও মহানুভবতার গুণাবলি থেকে বঞ্চিত সে সমাজের দরিদ্র ও অসহায়া মেয়েরা এবং মায়েরা দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থার জন্যে বাইরে বেরুতে বাধ্য হয়। এই সমাধানের জন্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুগামীরা যে বিকল্প পেশ করেছে তা সমস্যাকে সমাধান করার পরিবর্তে আরো জটিল করে দিয়েছে। তারা এক সমস্যার সমাধানের জন্যে তার চেয়েও বড় সমস্যার পথ গ্রহণ করেছে। গোটা পাশ্চাত্য, এমনকি আমাদের দেশেও সে সব জটিল সমস্যার তিক্ত বাস্তবতা আমাদের সামনে রয়েছে। এসব সমস্যাই আজ আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। যাবতীয় অপরাধ প্রবণতার মূলে রয়েছে এই সমস্যা।

কিন্তু ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম এধরণের অবস্থায় দরিদ্র, বিধবা, এতীম ও পঙ্গু বা এ ধরণের যে কোন অভাবগ্রস্থদের অর্থনৈতিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্যে সার্বজনীন বায়তুলমাল অর্থাৎ সাহায্য তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করেছে। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন—

"তাদের ধন-সম্পদে অভাবী এবং বঞ্চিতদের অধিকারও রয়েছে।"

(জারীয়াত—১৯)

বিশেষজ্ঞরা 'বঞ্চিত' বলতে ওসব লোকদের বুঝিয়েছেন, যারা নিজেদের চাহিদা পূরণের মত আয় করতে অসমর্থ এবং সেসব নারী যাদের কোন পৃষ্ঠপোষক নেই তা সে নারী ছোট হোক বা বড়, তাদের সবাইকে বায়তুলমাল থেকে অংশ দেয়া হবে। কারণ যে কোন অভাবী নারী তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যে কোন অবলম্বনের প্রত্যাশী। একইভাবে এতীম ছেলেমেয়েদের লালনপালনের ভারও ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। বিধবা ও অসহায়া নারীদের মত এতীমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও বায়তুলমাল থেকে করা হ'বে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উপার্জনে সক্ষমতা অর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বায়তুলমালের সাহায্য পাবে।

প্রিয়নবী (স) ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করেছেন—

"প্রতিটি ব্যক্তি, যারা মুমিন, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা আমার সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশী যোগ্য।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন—

"নবী, ঈমানদারদের জন্যে তাদের নিজ নফসের চেয়ে বেশী উত্তম।"
(আহযাব—৬)

বোখারী শরীফের এক বর্ণনা মোতাবেক প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

"যে মুসলমান মৃত্যুকালে কোন ধন-সম্পদ ছেড়ে যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের (প্রাপ্য)। আর সে যদি ঋণ এবং অসহায় পরিবার-পরিজন ছেড়ে যায় তাহলে তাদের ব্যাপারে আমিই দায়িত্বশীল।"

(এছাড়া ইসলাম সমাজের অভাবগ্রস্থ ও আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত লোকদের সমস্যার সমাধান এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্বহালের জন্যে বিভিন্ন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত বই-পত্র আপনারা অধ্যায়ন করতে পারেন।)

বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুস্থ ও সুন্দর সমাজের পরিচয়। আদর্শ কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের জন্যে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন একান্তই অপরিহার্য। সুতরাং কোন অবস্থাতেই যেন এমন অবস্থা না হয় যে সমাজে দোষ ও অপরাধের সুযোগ অবশিষ্ট রাখা হবে এবং যার পরিণতিতে বিপদগ্রস্থ নর-নারীদের সেই তিক্ত যাতনা সহ্য করতে বাধ্য করা হবে। দোষ করবে কেউ আর তার ফল ভোগ করবে অন্য কেউ, তা হতে দেয়া যায় না।

—o—

নারী গৃহপ্রদীপ না বাজারের পণ্য ?

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র কি ? এটা কোন প্রশ্ন নয় যে, দু'চার কথায় এর জবাব দেয়া যাবে। এর সম্পর্ক মানবস্বভাব ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এজন্যে নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে মানব স্বভাব ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা জরুরী। তাছাড়া কোন সমস্যার যথার্থ সমাধান করার জন্যে স্বভাব-প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা খুবই জরুরী।

এই নীতিকে সামনে রেখে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন প্রথম পদক্ষেপেই আমরা দেখতে পাই যে স্বয়ং আল্লাহ্ই নারী ও পুরুষ উভয়কে পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এই বণ্টনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিছক লিঙ্গগত বণ্টন নয়। আর আল্লাহ নিছক যৌন আনন্দভোগের জন্যেই নর ও নারীকে সৃষ্টি করে লাগামহীন ছেড়ে দেননি। কারণ এটা আল্লার সৃষ্টি কৌশল ও উদ্দেশ্যের বিরোধী। এই বণ্টনের উদ্দেশ্য আসলে সেই উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মাঝেই এই বণ্টন সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ থেকে বুঝা যায় যে এই পৃথিবী আর মহাপ্রকৃতি কোন ঘটনাচক্রে সৃষ্টি হয়নি বরং এটা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনারই বাস্তব ফলশ্রুতি। এর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যা মানুষের মনমেজাজে আলো বিকরণ করে। এসম্পর্কে চিন্তা করলে অজ্ঞানতার যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

কোন ব্যক্তি যখন এই বিশ্ব ও মহাপ্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্রষ্টার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে এমন সব বিস্ময়কর সত্যের যবনিকা তার

সামনে উন্মোচিত হয়ে যায় যা তার জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তাকে করে আলোকোজ্জল। এরপর মানুষ সতঃস্ফূর্তভাবে আল্লার ক্ষমতা ও সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে তাঁর সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়।

এই দৃশ্য জগৎ ছাড়াও আল্লার আরো বড় এবং আরো বিষ্ময়কর এক অদৃশ্যজগতও সৃষ্টি করে রেখেছেন। আবার দৃশ্যজগতের এমন অনেক বস্তু এবং রহস্যও সংগোপন রয়েছে যাতে মানুষের ভাবনা চিন্তার অনেক কিছুই রয়েছে। মানুষ যাতে এসব কিছু দেখে শুনে আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তার প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাচিত্তে সিজদাবনত হয়—সেটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

এতে করে আমরা জানতে পারি যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর জন্যে পৃথক পৃথক স্থায়ী ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এবং প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকে তার স্বভাব ও ক্ষমতা মোতাবেক গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তাদের কর্ম ও দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি বস্তু বা প্রাণী তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লার সৃষ্টি কৌশল এবং উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা ঘোষণা করে।

এই পৃথিবী এবং মহাপ্রকৃতির সব সৃষ্টির মধ্যে শুধু মানুষকেই এসব সত্যতা ও বাস্তবতা বোঝার জানার ক্ষমতা ও গুণাবলী দান ক'রে তাকে সবার উপর বিশেষভাবে সম্মাণিত করা হয়েছে। মানুষকেই কেবল সৃষ্টি-বৈচিত্র তার রূপ প্রভাব ও তাৎপর্য্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ক'রে মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের বিভিন্ন বিস্ময়কর দিক নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করে জ্ঞানবুদ্ধির প্রমান দিতে পারে এবং আল্লাহ্ মানুষকে নম্রতা-ভদ্রতা, মহানুভবতা ইত্যাদি মহৎগুণ দানে তাকে সরাসরি আল্লার ওহী ও রিসালাতের মর্যাদা লাভের জন্যে যোগ্য করে তুলেছেন।

এসব বাস্তবতার আলোকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আল্লাহ-তায়ালা মানুষকে নারী পুরুষ হিসেবে আলাদা আলাদা গুণ-বৈশিষ্ট্যদান করে যে সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে বিরাট আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যও সক্রিয় রয়েছে। এই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই নারী ও পুরুষ নিজের জীবনকে সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার পরশে উজ্জলতর করে আল্লার নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দেয়। আসলে এটাই হচ্ছে

মানবঅস্তিত্বের উদ্দেশ্য আর ঐই উদ্দেশ্যের স্বার্থকতা ও পূর্ণাঙ্গতাকে নিশ্চিত করণের জন্যে মানুষকে নর ও নারীতে বন্টন করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে মানুষ অর্থাৎ নর ও নারীর কর্ম ও তার কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা কোন বুনিয়াদী লক্ষ্য নয় বরং এটা হচ্ছে লক্ষ্যে পৌছানোর সহজ ও সুন্দর উপায় মাত্র। ঠিক এই উপায়েই মানুষ তার স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং এরই মাধ্যমে তার জীবনের পরম সাফল্য অর্জিত হয়।

যেহেতু মহাপ্রকৃতির এই বিপুল সৃষ্টি বৈচিত্রের স্বয়ং কোন তাৎপর্য্য নেই কিন্তু যেহেতু এসবের মাধ্যমে আল্লার নৈকট্য অর্জন করা যায় তাই এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকৃত হয়। এজন্যে কেবল মানুষকেই সেই গুণ ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে সে আল্লার অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। এই স্বীকৃতিই মানুষকে সত্যের সাথে পরিচিত করে। সুতরাং মানুষের পুরো অস্তিত্বই দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে শুধু এই জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে তারা আল্লার অস্তিত্বের সত্যতা বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে অর্থাৎ শুধু আল্লারই ইবাদাত বা উপাসনা করবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে বলেছেন—

> "আমি জিবন ও মানবকে এছাড়া আর কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি যে তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে।"
>
> (জারিয়াত—৫৬)

সুতরাং জীবনের যে কোন সমস্যায় মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লার এই পরম উদ্দেশ্যকে সমনে রাখতে হবে। এভাবে নারীদের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও সেই বুনিয়াদী নীতিকে বিবেচনা করতে হবে। এই জন্যে তার অস্তিত্বের প্রকৃতি, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং মহাবিশ্বের বৈচিত্রে তার স্থান ও মানকে সামনে রেখেই সব কিছু বিচার বিবেচনা করতে হবে। এটাই হবে আসল বিবেচনা পদ্ধতি। এছাড়া আর সব পদ্ধতি বা চিন্তাধারা চরম ভুল ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে।

অর্থোপার্জনে নারীর দুর্বলতার মানে

পূর্বের আলোচনার পর্যালোচনা করলে তার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নারী বা পুরুষের যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে তাদের স্বভাব প্রকৃতিকে

সামনে রাখতে হবে। কারণ তার যাবতীয় গুণ ও ক্ষমতা এবং দেহিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। আমরা এই প্রকৃত অবস্থাকে সামনে রেখে কোন সিদ্ধান্ত নিলে পরেই তা সত্যিকার অর্থে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব।

এই বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে নারীকে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তানকে দুধ খাওয়ানো, তাদের প্রশিক্ষণ, গৃহস্থালীর ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্যে জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

স্রষ্টা নর ও নারীর জন্যে যে আলাদা আলাদা স্বভাব ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সীমা লংঘন বা তা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর যদি কেউ তার নির্ধারিত স্বভাব ও কর্মের সীমা লংঘন করে তাহলে তাতে করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলীর সৃষ্টি হবে। চুম্বকের যেমন আকর্ষণশক্তি ও স্বভাবকে অস্বীকার করা যায়না এবং তেমনি বরফের স্বভাব চুম্বকের মতো আকর্ষণশীল নয়। কেননা উভয়ের গঠন ও গুণ ও প্রকৃতি আলাদা আলাদা। এভাবে প্রতিটি বস্তুরই পৃথক পৃথক গুণ ও প্রকৃতি রয়েছে। এসব গুণ ও প্রভাব অস্বীকার করা একান্তই কঠিন। যদি কোন বস্তুর গুণ ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয় তাহলে সে বস্তু তার মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য হবে। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এই সত্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লার বাণী। সুতরাং পুরুষ নারী হতে পারেনা আর নারীও পুরুষ হতে পারেনা। একইভাবে তারা একে অন্যের কর্ম ও দায়িত্বের সামীয় অনুপ্রবেশও করতে পারে না। যদি করে তাহলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে এবং তাদের মৌলিকত্ব খর্ব হবে। এই জন্যে ইসলাম নারী ও পুরুষে কর্ম ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীর জন্যে তার নারীত্বই যথেষ্ট। তার উপর জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব চাপানো যাবেনা। ইসলাম সেই দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যাস্ত করেছে। নারী ও পুরুষের কর্ম ও দায়িত্বের ক্ষেত্রও সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের স্বভাব প্রকৃতি, ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে সামনে রেখেছে এবং এ জন্যে তাদেরকে পরস্পরের কর্ম ক্ষেত্র ও দায়িত্বের সীমানায় অনুপ্রবেশ করতে নিষেধ করেছে।

নারী ও পুরুষের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাপক ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে। এসব বিধি-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ এবং বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক মান ও গুণকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে ইসলামের বিবাহ বা দাম্পত্য বিধি, মা ও সন্তান সংক্রান্ত বিধি, ওয়ারিশ সূত্র বা উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা ইত্যাদি নীতি অত্যন্ত বাস্তবসংগত, সুবিচারপূর্ণ এবং সার্বজনীন কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

নারী তার বুকের দুধ খাইয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে আর তার আগে একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত তাকে জন্ম দেয়ার জন্যে গর্ভে ধারণ করে। অন্যান্য সব কিছু বাদ দিলেও জীবন গঠনে নারীর এই দুটি অবদানের ঋণ মানবতা কোনদিনই শোধ করতে পারবেনা, নারীর এই মহত্তম ও কঠিনতম দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে সংসারের অন্যসব কায়কসরৎ থেকে মুক্তি দান করেছেন। এত বড় দায়িত্ব পালনের পর তার উপর জীবিকা অনুসন্ধানের দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়াটা বিরাট অবিচার হবে। আল্লাহ নারীর মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা, নম্রতা-কোমলতা, সহানুভূতিশীলতা ইত্যাদি মহৎ ও সুন্দর উপলব্ধি দান করে রেখেছেন এবং তা দাম্পত্যবিধি ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য ছিল একান্তই জরুরী

স্ত্রী তার স্বামীকে এবং মা তার সন্তানকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখার জন্যে কতো যে চেষ্টা সাধন করে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এর জন্যে তারা অসংখ্য দুঃখকষ্ট এবং ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করতে পিছপা থাকেনা। মা তার সন্তানের স্বার্থে জীবনের বাজী লাগিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনা, নিজে শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও সন্তানকে সুখে ও নিরাপদে রাখার চেষ্টা সংগ্রামে নিবেদিতা মাকে নিজের জন্যে সবরকম আরাম আয়েশের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়।

নারী তার সুস্থ সবলদেহী স্বামী অথবা তার যোগ্য উপযুক্ত সন্তানকে দেখতে পেয়ে জীবনের পরম আনন্দ ও স্বার্থকতা অনুভব করে। তার শান্ত ও নম্র স্বভাব চায় তার স্বামী ও ছেলে ব্যক্তিত্ববান হয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিক। অন্যদিকে প্রতিটি স্বামীই তার স্ত্রীর কাছে স্বস্তি, সান্তনা ও

ভালবাসা কামনা করে। স্ত্রীর অবর্তমানে সারা দুনিয়া তার কাছে নিরস ও অর্থহীন মনে হয়। সে তার পূর্ণ শক্তি ও সক্ষমতা সত্ত্বেও নারীর শান্ত নম্র সংস্পর্শের জন্যে অস্থির হয়ে উঠে। কারণ স্ত্রীর সংস্পর্শই তার মধ্যে সেই অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে যার মাধ্যমে সে পায় দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস। আর এই উপায়েই তার সৃষ্টি হয় নতুন কল্পনা ও আবেগ উদ্দিপনা।

পবিত্র কোরানে নারীর এই গুণাগুণকে ব্যাপক অর্থে বুঝানোর জন্যে 'স্বস্তি' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

আসলে নারীর সব গুণাবলী ও অবদান হচ্ছে এই স্বস্তিরই ফলাফল। এরই মাধ্যমে দেহ ও আত্মার পবিত্রতা-পরিশুদ্ধি, দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত হয় এই স্বস্তিই হচ্ছে জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি যা মানুষ কেবল নারীর কাছ থেকেই পেতে পারে। তাই নারীর এত বড় অবদানের পর তাকে তার কর্মসীমার বাইরের কাজ করতে বাধ্য করা কোন অর্থেই সুবিচারপূর্ণ হতে পারে না।

এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীর জন্যে তার স্বভাব ধর্ম ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারী তার জীবনে নিজের গুরুত্ব, মর্যাদা ও কর্তব্য জেনে বুঝে নিতে পারে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে। সুতরাং নারীর স্বভাব, সক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কর্মক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এবং তা নারীর জন্যে পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত।

এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমপর্যায়ের অর্থাৎ নারী ও পুরুষের একই শিক্ষা নীতি ও ব্যবস্থার বা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ প্রকৃতিই তাদের স্বভাব-ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্রের বন্টন করে রেখেছেন সে হিসেবে তাদের শিক্ষার ধরণ-ধারণ ও বিষয়াবলীও হবে আলাদা আলাদা। নারীকে ততটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যতটুকু তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য জরুরী। অনুরূপভাবে পুরুষকেও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে। সেখানে দৈহিক

ও আধ্যাত্মিকভাবে উভয়ের গুণাবলি ও ক্ষমতা সমমানের সেসব ক্ষেত্রে উভয়কে একই রকম জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে। এব্যাপারে নর ও নারীর আবেগ-অনুভূতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এখন যদি কেউ বলেন যে, পুরুষকে যেসব নম্র ও কোমল আবেগ-অনুভূতি দান করা হয়েছে তাতে করে পুরুষ চাইলে নিজ দায়িত্ব পালনের সাথে নারীদের কোন কোন দায়িত্বও পালন করতে পারে। একইভাবে নারীকেও যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে তাতে করে সে চাইলে পুরুষের মতো কাজ করে অর্থ উপার্জনের দায়িত্বও পালন করতে পারে। --- মেনে নিলাম কোন কোন ক্ষেত্রে তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তা উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর হবে। কারণ পুরুষ যদি নারীসুলভ কর্মে হাত দেয় বা নারীর কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তার বিশেষ ক্ষমতার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তার পৌরুষও শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের জন্যে অক্ষম ও অযোগ্য হয়ে পড়বে। গোটা সমাজ জীবনে ভিষণ বিশৃংখলা এবং অরাজকতার সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঠিক একই কথা, নারীর বেলায়ও প্রযোজ্য। নারী যদি তার স্বাভাবিক কর্মসীমা ডিংগিয়ে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তার নারীত্বের দায়িত্ব অসমাপ্ত পড়ে থাকবে এবং ক্রমে সে তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যও হারিয়ে বসবে। এভাবে গোটা মানবতা এক মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। অথচ মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ শুধু তখনই সুনিশ্চিত হতে পারে যখন নারী ও পুরুষ উভয়ই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের দায়িত্ব পালনের সাহায্য-সহযোগিতা করে। কিন্তু নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা যদি একে অন্যের দায়িত্বে গ্রহণ করে নেয় বা একে অন্যের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। আর তা হবে প্রত্যেকের জন্যে ক্ষতিকর। সুতরাং তাদেরকে স্বভাব ক্ষমতা আবেগ অনুভূতি মোতাবেক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলাম এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তাদের কর্মসীমা মোতাইয়েন এবং সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি জারি করেছে।

এছাড়া নারীর এমন কয়েকটি প্রাকৃতিক সমস্যা ও অপারগতা রয়েছে যার কারণে সে অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেমন তার মাসিক ঋতু, সন্তান গর্ভধারণ কালে ও প্রসবের পরবর্তী নেফাস, সন্তানকে দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে নারীকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব সমস্যার আলোকে আমরা চাই সংশ্লিষ্ট সব বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলে ধরি যা জানা ও বুঝা প্রত্যেকের জন্যেই জরুরী এবং এই জন্যেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিরাট অংশ নারীর এসব প্রাকৃতিক সমস্যা ও অসুবিধার আলোচনা ও স্বাস্থ্য বিধি প্রণয়নে ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে নারীর প্রতিটি দৈহিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে বিশেষ লক্ষণ ও প্রভাবের বর্ণনা রয়েছে এবং একটি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা জরুরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা নীচে বর্তমান শতাব্দীর মহান চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী সংস্কারক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর রচিত গ্রন্থ "পর্দা ও ইসলাম" থেকে একটি গবেষণামূলক সারাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন—

"জীব বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে নারী তার আকার আকৃতি এবং প্রকাশ্য অংগ প্রত্যঙ্গ থেকে নিয়ে নিজ দেহের অনু ও স্নায়ুকোষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই পুরুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। যে সময় মাতৃগর্ভে শিশুর মধ্যে লিংগ গঠন (SEX FORMATION) শুরু হয় সেই সময় থেকেই উভয় লিংগের দৈহিক কাঠামো পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে।

প্রাপ্তবয়স্ক অর্জনের পর মাসিক ঋতুর ধারা শুরু হয় যার প্রভাবে তার শরীরের সব অংগ প্রত্যংগের ক্রিয়া প্রভাবান্বিত হয়। জীববিজ্ঞানী ও অংগ প্রত্যঙ্গ বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক জানা যায় যে, মাসিক ঋতুকালীন অবস্থায় নারীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়—

(১) শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি কমে যায়। এজন্যে বেশী তাপ নির্গত হবার ফলে তাপমাত্রা নেমে যায়।

(২) নাড়ী লঘু হয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, রক্তকোষের সংখ্যা পার্থক্য-সূচীত হয়।

(৩) ENDOCRINES, গলার হাঁড় TONSILS এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন সূচিত হয়।

(৪) হজম ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং স্নায়ুশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৫) জোড়ে-জোড়ে আলস্যতা, আবেগ উদ্দীপনায় ভাটা দেখা দেয় এবং স্মরণ ও চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি কমে যায়।

এসব পরিবর্তন একজন সুস্থ নারীকে রুগাবস্থায় এতটা নিকটতর করে দেয় যে তখন সুস্থ অসুস্থতার মধ্যে প্রভেদ করাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ৫ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক ডাঃ এ্যামিল লোভেক বলেন—

"ঋতুবতী নারীদের মধ্যে সাধারণত যেসব লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে মাথাব্যাথা, ক্লান্তি, অঙ্গ শিথিলতা, স্নায়ু দৌর্বল্য, হীনমন্যতা, অস্বস্তি, বদহজমী, কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কখনো কখনো বমি বা বমি বমি ভাব।" ডাঃ লোভেক তাঁর মতের সমর্থনে বিভিন্ন গবেষক বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের অভিমতের উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ঋতুকালীন অবস্থায় নারী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে।* সাইয়েদ মওদূদী তাঁর গ্রন্থে আরো বলেন—

"ঋতুকালীন অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন অবস্থা হয় আরো কঠিন। এ সম্পর্কে ডাঃ রিপ্রেভ বলেন, "গর্ভকালীন অবস্থায় নারীর ক্ষমতা কোনভাবেই দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের সেই বোঝা গ্রহণ করতে পারেনা যা সে গর্ভ-কালীন অবস্থা ছাড়া অন্যান্য সময় করতে পারে। এ সময় নারী যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, যদি কোন পুরুষ বা গর্ভহীণ নারী সেই অবস্থায় পড়ে তাহলে তাদের নিশ্চিত রোগী বলে সাব্যস্ত করা হবে। এমতাবস্থায় বেশ কয়েকমাস যাবৎ তার স্নায়ু ব্যবস্থা ব্যাহত থাকে এবং তার মানসিক ভারসাম্যও বিগড়ে যায়। তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তখন অস্বাভাবিকতার শিকারে পরিণত হয়। একথার সমর্থনে তিনি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞে অভিমত উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই অবস্থায় নারী প্রাকৃতিকভাবে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের অক্ষম হয়ে পড়ে।

এরপর সন্তান প্রসব ও তার পরবর্তীকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাইয়েদ মওদূদী বলেন,—"সন্তান প্রসবের পর বিভিন্ন রোগে

আক্রান্ত হবার এবং তা বৃদ্ধি পাবার আশংকা থাকে। প্রজনন জনিত ক্ষত যে কোন বিষাক্ত উপসর্গ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। গর্ভের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে তখন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক ধরণের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যা সমগ্র দেহ-ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়। যদিও কোন আশংকা থাকে না তবুও তার আসল স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। এভাবে প্রসবের পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত নারী আসলে অসুস্থ বা অর্ধ সুস্থ অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় তার কর্মক্ষমতা অর্দ্ধেক এবং অর্দ্ধেকের চেয়েও অর্দ্ধেকে নেমে যায়। (পর্দা—১৩৯-১৪১)

চিকিৎসাবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার এসব ফলাফল থেকে খুব ভাল করে বুঝা যায় যে, মাসিক ঋতু, গর্ভকাল, প্রসব ও তার পরবর্তী অবস্থায় নারীর শরীর ও মন মেজাজের কি অবস্থা হয়। এসব বাস্তবতার আলোকে এ ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না যে ইসলাম কেন নারীকে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। আসলে এটা নারীর প্রকৃতিরই দাবী ছিল।

উপরের বর্ণনা থেকে নারীর অপারগতার তিনটি বিশেষ কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

(১) নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। যেমন দাম্পত্য বিধি, মাতৃত্ব এবং আবেগ অনুভূতির নম্রতার কারণে নারী অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

(২) সে জ্ঞান বুদ্ধির ততটুকু অংশ পেয়েছে তা তার প্রকৃতি ও কর্তব্য এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিকে ভাল করে বুঝে নিতে পারে আর তাকে কার্য্যকরী করতে পারে। অন্যদিকে পুরুষকে ততটুকু জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যাতে করে সে তার বাইরে দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এইজন্যে বাইরের কাজকর্মের ব্যবস্থাপক তাকেই বানানো হয়েছে।

(৩) নারীকে ঋতু, প্রসব ও তার পরবর্তীকালে এমনসব অবস্থার মুখোমুখী হতে হয় যা তার মানসিক, শারীরিক সক্ষমতা ও চিন্তাশক্তিকে বিকল করে রাখে। এর বাস্তবতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি একটু আগেই আমরা উল্লেখ করছি।

আধুনিক বিজ্ঞান নারী সংক্রান্ত এসব বাস্তবতাকে প্রমাণ করে ইসলামী নীতির বাস্তবমুখিতা এবং মানবতার জন্যে তার উপকারিতাকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে নারীকে যে তার স্বভাব বিরুদ্ধ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়েছে এবং আজো হচ্ছে—তাতে সে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আক্কাদ বলেন—

শুরু থেকেই রান্না-বান্না করার দায়িত্ব নারীই পালন করে আসছে। পরিবারের লোকদের খাবার নারীই তৈরী করে থাকে। তা নারী আধুনিক উন্নত সমাজের হোক বা পশ্চাদপদ কোন উপজাতির,—সে স্বাভাবিকভাবে রান্নাবান্নার কাজ পসন্দ করে। আর আজ হাজার হাজার বছর পরও যখন আমরা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছি তারা এখনো পুরুষের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। পুরুষ যে সব কর্মকে অনায়াসে আয়ত্ব করে নিতে পারে তা শেখার জন্যে নারীকে সীমাহীন কাঠিন্যের মুখোমুখি হতে হয়, এরপরও তার মধ্যে আস্থা বা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়না। যেমন, প্রাচীন যুগ থেকেই নারীকে সেলাই ও রকমারী সূচীকার্য্য শেখানো হচ্ছে এবং এখনো তার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও আজকের নারী নিত্য-নতুন ফ্যাশান আর সূচীকর্মের ব্যাপারে পুরুষের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল। সে নিজের কাজে উপর সন্তুষ্ট নয়। এজন্যে দেখা যায় যে নারী তার এই চিরাচরিত কাজটি শেখার জন্যে সেসব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়—যার দায়িত্বশীল হয় পুরুষ। কিন্তু সেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরাই দায়িত্ব পালন করে তারা নারী হয়েও সেসব প্রতিষ্ঠানের দিকে এগোয়না।

(আল মারায়া-আল কানুন পৃষ্ঠা-৬,৮,১০)

এরপর অধ্যাপক আক্কাদ কয়েকটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন অতীতকাল থেকে এসব নারীদেরই পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসা সত্বেও তারা এসব ক্ষেত্রেও পুরুষের পেছনে পড়ে রয়েছে, অথচ পুরুষ অতি সম্প্রতি এসব মেয়েলি কর্মে হাত দিয়েছে।

দু'জন ডাক্তার-এর মধ্যে একজন একটি বিশেষ চিকিৎসা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—আমাকে জানিয়েছেন যে, মহিলা ডাক্তারের

তুলনায় পুরুষ ডাক্তারকে নারী সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার জন্যে বেশী উপযুক্ত মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন লোকের ধারণা ছিল যে আজকাল বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে মহিলা ডাক্তারদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এখন নারীসংক্রান্ত রোগব্যাধির চিকিৎসা তারা নিজেরাই উত্তমভাবে করতে পারবে এবং পুরুষ ডাক্তাররা এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধারণা যথার্থ ছিল না এবং নারী সংক্রান্ত রোগ ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে পুরুষ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে।"

এভাবে বিখ্যাত চিন্তাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ জাকী আবদুল কাদের আসসাহ্ফী বলেন—

"সেদিন দূরে নয় যখন নারী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও অচল হয়ে পড়বে যেভাবে তারা কর্মের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বিভাগেও অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। কারণ উল্লেখিত বিভাগ সমূহের পেশাগত দায়িত্বে যে সাধনা ও পরিশ্রমের দরকার হয় তারচেয়ে অনেক বেশী সাধনা ও পরিশ্রমের দরকার হয় রাজনীতি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। তা' তারা যদি এসব ময়দানে চলতে না পারে তাহলে তাদের কাছ থেকে কোন উন্নতির প্রত্যাশা কিভাবে করা যেতে পারে। বস্তুতঃ তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে তাদেরই বিশেষ কর্ম পালনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ীই তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে।"

(আখবারুল ইয়াওয়াম পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

নারীদের কর্ম তৎপরতা ও ইসলাম

নারীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই জরুরী। এর একটি হ'ল তার স্বভাব প্রকৃতি এবং অন্যটি হচ্ছে শরীয়তের বিধান।

১) মহিলাদের কোন কর্মকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করা যাবে না যতক্ষণ না তাতে কোনরকমের পাপবোধ প্রকাশ পায়। ইতিহাসের সকল পর্যায়ে নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাসং-

গিক কাজকর্মও করে আসছে। অবশ্য এসব প্রাসংগিক কাজকর্মকে কক্ষণো প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যেমন নারী সব যুগেই রান্না-বান্না, সিলাই, সূচী শিল্প, সূতা কাটা, ফুলতোলা ইত্যাদি কর্মে সবসময়েই অংশ নিয়ে আসছে, এর সাথে সাথে সে ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর সেবা-যত্ন ইত্যাদি তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্বও পালন করে আসছে।

এসব কাজ যে স্বতস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক স্বভাবের তাগিদেই করে থাকে। তাকে এসব বাড়তি কাজ করার জন্যে জোর জুলুম করা হয় না। এসব কাজ-কর্ম যদিও তার বুনিয়াদী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি পুরো আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে নারী এসব করে থাকে।

ইসলাম কাজকর্মের বন্টনের সময় এই বাস্তবতাকেও বিবেচনাধীন রেখেছে যা তাদের মানবিক স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখন প্রিয়নবীকে তাদের নিজ নিজ কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন প্রিয়নবী হযরত আলীর উপর বাইরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব এবং হযরত ফাতেমার উপর ঘরোয়া কাজকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ইসলাম একসাথে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে যে ঘরে থেকে ছেলে-মেয়ের লালন পালন ও প্রশিক্ষণ এবং স্বামী সেবার দিকে মহিলাদের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই বেশী। আর তা তার বুনিয়াদী দায়িত্বের পরিপন্থীও নয় বরং এতে করে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো মজবুত হয়ে উঠে।

স্ত্রী যদি কোন বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে থাকে এবং ঘরের পরিবেশে তা করতে চায় এবং তাতে করে তার আয় উপার্জনও হয় তাহলে তাকে তার কাজে বাধা দেয়া উচিত নয়, বরং স্ত্রীকে তার জানা কর্ম করতে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়াই উচিৎ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সে তার আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু সেইকাজেই লেগে থাকবে।

যেহেতু প্রতিটি কুমারী মেয়েকেই কোন না কোন দিন কারো স্ত্রীত্ব বরণ করতে হয় এই জন্যে বিভিন্ন পারিবারিক ও দাম্পত্য জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে

তার অধিকার স্বীকার করে; যাতে করে সে সংশিল্ট সব বিষয়ের সমস্যাদি সমাধানের পন্থা জানতে পারে। সে এমন শিক্ষা অর্জন করবে যার মাধ্যমে সে তার কর্মক্ষেত্রের যাবতীয় বর্তমান বিষয়াদি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয়াদি ব্যাপারে অবহিত হতে পারে

(২) প্রকৃতি যেহেতু নারী'ই বানিয়েছে, এজন্যে তার এসব কাজকর্ম কোন ভ্রান্তি বা সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা অর্জনের মতো ক্ষমতা এবং গুণাবলী ও তাকে দেয়া হয়েছে।

ঘর বাড়ী হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র। ঘরবাড়ীতে অবস্থান করে নারী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে এবং এই ঘরবাড়ীতে অবস্থান করেই সে যাবতীয় বিপদ ও অপমানের হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এই ঘরবাড়ীতেই সে পায় পরম শান্তি-স্বস্তি ও অনাবিল আনন্দ। তাই ঘরবাড়ীকেই নারীর ভূস্বর্গ বলা হয়ে থাকে এবং ইসলাম এই বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছে—

> "তোমরা যেমন তাদেরকে তাদের ঘরদোর থেকে বের করবে না তেমনি তারা নিজেরাও বের হবে না।" (তালাক-১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম করতুবী বলেন—

> "স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার কোন অধিকার কোন স্বামীরই নেই এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া স্ত্রীর জন্যেও বৈধ নয়।"
> (জামেউল আহকামুল কোরান—অষ্টাদশ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

এই আয়াতটি আসলে ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতের ধারাবাহিকতাতেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর আদেশ সাধারণ স্ত্রীদের বেলায়ও সমানভাবে কার্যকারী হবে। ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আরাবী বলেন—

> "ইদ্দতকালীন অবস্থায় নারী নিজের ঘর থেকে মোটেই বেরুবে না। অবশ্য অপরিহার্য প্রয়োজনে বেরুতে পারবে আর তখন সে সাধা-

রণ স্ত্রীদের মতই বেরুতে পারবে, কারণ ইদ্দত বিয়েরই অন্যতম শাখা।"

(আহকামুল কোরান.—ইবনে আরাবী, দ্বিতীয় খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)

ফিকাহ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞদের মতে আল্লাহ্ তাঁর বাণীতে নারীদের ব্যাপারেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ ঘর প্রকৃত অর্থে স্বামীদের মালিকানায় হওয়া সত্বেও তা নারীদের ঘর বলেই বলা হয়েছে। কারণ নারীকে সারা জীবন তার স্বামীর ঘরেই থাকতে হয় এবং বিনা দরকারে সেই ঘর থেকে বেরুবার অনুমতি নেই। এই জন্যে ঘরকে নারীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(আহকামুল কোরান লিল্ জাস্সাস)

আল্লামা কাসানী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—

"বিয়ের পর নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ আর তা এই জন্যেই যে পবিত্র আয়াতে আদেশমূলক পরিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।" (বাদায়েউ সমায়া 'অলিল কাসানী' ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৩)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর পক্ষে ঘরে অবস্থান করাটা তার প্রকৃতি এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরী। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সে বাইরে বেরুতে পারে। সেই স্বাধীনতা তার রয়েছে তবে তা লাগামহীন হবে না। প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন—

"মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের গৃহ তাদের জন্যে অধিকতর উত্তম।" (আবুদাউদ)

যেহেতু ইবাদাতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ মানুষের জীবনে হতে পারে না। তাই নারীদেরকেও ইবাদাতের জন্যে মসজিদে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তবে এটাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নারীদের জন্যে ঘরের নামাজ মসজিদের নামাজের চেয়ে উত্তম। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, ঘরকে মসজিদের চেয়ে উত্তম বলা হচ্ছে। না, তা নয়। এটা শুধু নারীদের সুবিধার্থেই বলা হয়েছে। নয়তো অন্যান্য অনেক হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে মসজিদ। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম স্থানের চেয়ে নারীদের জন্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তার গৃহকে। এক

উদ্দেশ্য হ'ল তার মানমর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করা। কারণ ঘরের বাইরে নারী যে কোন সমস্যা বা বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে।

মহিলাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এ ছিল দুটি বিষয়। এই দুটি বিষয়কে বিবচনাধীনে রাখলে কোন ভুলভ্রান্তি হবার আশংকা থাকে না।

প্রথমতঃ এই যে, আনুষঙ্গিক কাজকর্মে তৎপর হওয়া ভাল, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এতে করে যেন তার আসল দায়িত্বে অবহেলা না করা হয়। কারণ তাতে করে তার নারীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ব্যাহত হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে নারীর স্বাভাবিক স্থান হচ্ছে তার গৃহ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই তার জন্যে এ স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং বিনা দরকারে ঘর থেকে বেরুনো তার জন্যে উচিৎ নয়। ইমাম মালেকের ভাষায় তার উদ্দেশ্য হচ্ছে— "সে সব ক্ষতি ও বিপদের হাত থেকে বেঁচে থাকা যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।"

ইসলাম নারীদের তাদের স্বভাবসম্মত ক্ষেত্র সীমায় থেকে যে কোন রকমের দৈহিক ও মানসিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে। কোন নারী শহরে হোক বা গ্রামে, বেতন ধারিণী হোক বা অবৈতনিক যে কোন কর্ম করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে সে লেবাসে পোষাকে, চরিত্রে শিষ্টাচারে ব্যবহারে ইসলামের নির্দ্ধারিত নীতি ও ব্যবস্থাবলী মেনে চলবে এবং পর পুরুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করবে না।

ইসলাম নারীদেরকে ক্ষেত খামারে গিয়ে কাজ করার এবং নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বেচা-কেনা করার স্বাধীনতাও দিয়েছে। যেমন তার নিজের জন্যে বা পরিবারের লোকদের জন্যে খাদ্যদ্রব্য বা পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি কেনাকাটা করতে পারে। এছাড়া সে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যেও বেরুতে পারে। যেমন কোন ওয়াজ-নসীহত বা ইসলামী আলোচনা সভা-সম্মেলন ইত্যাদিতেও অংশ নিতে পারে যাতে তার নিজের বা অন্যান্যদের কল্যাণ রয়েছে।

মুসলিম শিক্ষিতা নারী মানুষের দ্বীনি সমস্যাবলীতে অভিমত বা রায় দিতেও পারে এবং সিদ্ধান্তও ঘোষণা করতে পারে। কারণ ইসলামী আইন-বিধি মোতাবেক অভিমত বা রায় দেয়ার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বিচার করার যোগ্যতাও রাখে।

যুদ্ধকালীণ অবস্থায় তারা মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্যে রণাঙ্গনেও যেতে পারে। যেমন আহত সিপাহীদের চিকিৎসা, পথ্য ও ঔষধ সেবন এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ করতে পারে। নির্ভরযোগ্য নিখুঁত বর্ণনা মোতাবেক প্রিয়নবীর আমলে মুসলিম মহিলারাও প্রিয়নবীর অনুমতি নিয়ে জিহাদের মাঠে যেতেন। সিপাহীদের সাহায্য সহযোগিতা, আহত ও অসুস্থদের দেখা-শুনা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং অন্যান্য চিকিৎসাদি করার দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। ইমাম বোখারী ও ইমাম আহমদ হযরত বরী বিনতে মউজের উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন—"আমরা প্রিয়নবীর সাথে জিহাদে যেতাম, আমাদের কাজ ছিল সিপাহীদের খেদমত করা তাদের পানি সরবরাহ করা এবং হতাহত-দের মদীনায় পৌছানো।"

শুধু তাই নয় মুসলিম নারী রণাংগনে অস্ত্র পরিচালনাও করতে পারে। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মোতাবেক আবুতালাহা (রা) এর স্ত্রী রমীসা (রা) হুনাইন যুদ্ধের সময় একটি খঞ্জর নিজের কাছে রাখেন।—যখন তাঁর স্বামী এর কারণ জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি জবাবে বলেন এটা আমি এজন্যে রেখেছি যে যদি কোন মুশরেক আমার কাছে আসার চেষ্টা করে তাহলে আমি তার পেট চিরে দেব। এ খবর প্রিয়নবীর কাছে পৌছুলে তিনি এ ব্যাপারে কোন আপত্তি প্রকাশ করেননি।

ইবনে হাজাম বলেন, নারীকে বিচারপতির দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফাও এই মতের সমর্থন করেন। হযরত ওমর সিকা নামক এক মহিলাকে হাটবাজারসংক্রান্ত বিষয়াবলীর তত্ত্বাবধারিকা নিযুক্ত করেছিলেন।

নারীদের এসব দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে কেউ যদি এই হাদিসটির উল্লেখ করেন যে প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন—

> "কোন জাতি কল্যাণ পেতে পারেনা যদি তার বিষয়াদির চাবীকাঠি নারীর হাতে থাকে।"

আসলে একথাটি প্রিয়নবী (সঃ) খিলাফতের সাধারণ বিষয়াবলী সম্পর্কে বলেছেন। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর অন্য একটি হাদীস হচ্ছে—

> "নারী তার স্বামীর ধনসম্পদের সংরক্ষণকারীণি। তাকে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

এই হাদীস মোতাবেক ইমাম মালিক একথা বলেছেন যে, 'নারীকে তত্বাবধায়িকা কৌশূলী, এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়াদির দায়িত্বশীলা হিসাবেও নিয়োগ করা যেতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই।"

(মুহাল্লা-নবম খণ্ড ৪২৯—৪৩৫)

মহিলাদের চাকরী-বাকরী

উপরের আলোচনা থেকে এটা জানা গেল যে কোন মহিলা একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া বাড়ীর বাইরে যাবে না এবং দরকারবশতঃ গেলেও ঘরসংসারের আসল দায়িত্ব ভুলে গিয়ে অন্যকোন কাজে দিন—মান নষ্ট করে আসবে না। সুতরাং কোন মহিলার জন্য ঘরসংসারের দায়িত্বে অবহেলা করে কলকারখানা বা দোকানপাট অন্যকোথাও নিয়মিত চাকরী করতে যাওয়া বৈধ নয়, যেমনটি আজকালকের মহিলারা করে বেড়াচ্ছে। কারণ এভাবে নারীর কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক সীমা লংঘিত হয়। এভাবে ক্ষমতা সে তার ক্ষমতা ও গুণাবলীকে এমন স্থানে ও এমন কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস পায় যা তার আদৌ কর্মস্থান বা তার দায়িত্বও নয়। নারীর আসল কর্মস্থল হচ্ছে তার গৃহ। তাছাড়া বাহিরে চাকরী করতে গিয়ে আরো কতো যে অবাঞ্চিত বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। যেসব মহিলা চাকরী করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা নিম্নে আলোচনা করছি।

প্রথম সাধারণতঃ তাদেরকে ভোরে ভোরে কর্মস্থলে রওয়ানা হয়ে যেতে হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাদেরকে এই রুটিন মেনে চলতে হয়।

এমনকি জীবনের শেষ দিকে একই চাকরী থেকে তারা অবসর গ্রহণ করে অথবা অযোগ্যতার জন্যে তাদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই নিত্যদিনের বহির্গমণ সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে তাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয় অনেক বেশী এবং তা শান্তি, স্বস্তি ও শৃংখলারও পরিপন্হি। এছাড়া স্ত্রীও যখন স্বামীর মতো স্হায়ী আয় উপার্জন করবে তাহলে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা হারাবে তেমনি উভয়েই শান্তি ও স্বস্তির জন্যে উম্মুখ হয়ে থাকবে উভয়েই যখন সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘরে ফিরবে তখন উভয়েই পরদিন ভোরে চাকরীস্হলে যাবার আগে তরতাজা হবার জন্যে কারো সহযোগিতার প্রত্যাশা করবে। এভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যখন ঘরের বাইরে চাকরীতে থাকবে তো ঘরসংসারের ব্যবস্হাপনা কে সামলাবে আর স্বামীরা শান্তি আর স্বস্তি খুঁজতেই বা কোথায় যাবে ? সারা দিনের ক্লান্ত স্ত্রী তাকে তার প্রত্যাশিত শান্তি ও স্বস্তি যোগাতে পারবে কি ? পারবে কি তাকে সজীবতা ও উৎসাহ্ উদ্দীপনা যোগাতে ? - - -

এতে করে বুঝা গেল যে নারীর পক্ষে চাকরী করতে যাওয়া তার নিজের জন্যে, স্বামীর জন্যে এবং পরিবার তথা সমাজের জন্যে ক্ষতিকর। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অন্যায়। আর আল্লাহ্ তাদের সুখশান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানেরও বিরোধী।

দ্বিতীয় ঃ—যেই চাকরীতে নারীর সময় ও জীবন নষ্ট হচ্ছে, যার চিন্তায় সে সততঃ উদ্বিগ্ন-তা তার চিন্তাধারা, আদর্শ, পোশাক পরিচ্ছেদ, শালীনতা, চরিত্র, রুচি ইত্যাদির উপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তার জীবন হয়ে উঠে বিরক্তিকর ও বিবর্ণ। মাসের পরে কয়েকটি টাকার লোভে সে তার জীবনের অনেক অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। সে নিজের বিবেকের কাছেও ছোট হয়ে থাকে। পরিণামে তার জীবন নিরেট জড়পদার্থের রূপ ধারণ করে। সে তখন টাকা ছাড়া আর কোন বিষয়কে মর্যাদাপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে পারে না। সে টাকার প্রতিযোগিতায় পড়ে অন্যের দেখাদেখি দিন-রাত ছুটতে থাকে। পরস্ত্রী কাতরতা আর অনুকরণের ব্যাধিতে সে

এমনই আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে অবশিষ্ট জীবনে তার নিষ্ঠুর কবল থেকে মুক্তির কোন পথই খুঁজে পায় না। ফলে যথেষ্ট টাকা পয়সা থাকা সত্বেও মুহূর্তের জন্যেও শান্তি ও স্বস্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

চিন্তা ও অনুভূতির এই বিকৃতিই তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দেয়। বেশী থেকে বেশী অর্থ ও স্বার্থের দুশ্চিন্তায় তার মানবিক আত্মা দারুণভাবে পীড়িত হয়। জীবনের সব মূল্যবোধ ও মহৎ চিন্তা বাদ দিয়ে সে কেবল ধন অর্জনের চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর এটাই তার স্বাভাবিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে দুর্লংঘ্য অন্তরায় হিসেবে সামনে দাঁড়ায়। এসব কারণে নারীকে বাইরে গিয়ে চাকরী করা উচিৎ নয়।

নারীর অর্থনৈতিক ব্যস্ততা ও জড়বাদী ধ্যানধারণা তার গর্ভধারনের অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা লুপ্ত করে না সত্য, কিন্তু তাতে করে যে নারীত্বের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, নারীত্ব কেবল দেহ ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষমতার নামই নয় বরং তার সাথে সাথে আল্লার নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য ও মান মোতাবেক চিন্তা ও কর্মের একতা এবং বিশেষ প্রাকৃতিক বিধি অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে নারীত্বের পূর্ণতা ও স্বার্থকতা। কিন্তু যারা এই মৌলিক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে জড়বাদী কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অবমাননা নিজেরাই করে থাকে। কারণ এতে করে তারা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্যপথ থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

এখন আসুন, এ ধরনের পরিবেশে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ধরন সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখি। নারী যে কয়টি টাকার জন্যে তার দেহমনের সব ক্ষমতা বিকিয়ে দেয় তাতে আসলে স্বামী-স্ত্রী বা পরিবারের কারো কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না। বরং সারাক্ষণ চাকরী ও টাকার চিন্তায় বিভোর থাকার ফলে তার দেহমনের উপর প্রতিকুল প্রভাব পড়ে। ফলে সে যথার্থভাবে স্ত্রীত্বের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে যায়। সে কাউকে শান্তি ও স্বস্তি পেঁছাবে কি যখন সে নিজেই তার স্বামীর মতো শান্তি ও স্বস্তি লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাকে।

এছাড়া স্বামীর মতো স্ত্রীও আয় করে বলে—তাদের দায়িত্বের মধ্যেও কোন বৈচিত্র থাকে না। এতে করে তাদের মধ্যে এক ধরনের অর্থনৈতিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাতে করে তারা পরস্পরের প্রতি পৃথক পৃথক গুরুত্বের বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলে। সুতরাং পরস্পরের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণে ভাটা পড়ে যায়। নারী তখন এই জন্যে স্বামীকে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না যেহেতু সেও তার মতো টাকা কড়ি আয় করছে এবং সংসারের ব্যয় ভার নির্বাহ করছে।—এরপর বলুন কোন্ সে অনুভূতি তাদের মধ্যেকার দাম্পত্য সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করবে, এবং কেনই বা এরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করবে?

স্বভাব প্রকৃতি ও আল্লাহর আইন মোতাবেক বুনিয়াদী কথা হচ্ছে নারী, পুরুষের জন্যে শান্তি ও স্বস্তির উৎস হবে। তা স্বামী কি এমন স্ত্রীর কাছে শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে যে বাইরে অন্য কোথাও কারো অধীনে চাকরি করছে? আর যখন ঘরে ফিরে তখন তার এমন অবস্থা থাকে যে সে নিজেই শান্তি ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যে অন্যের সাহায্য কামনা করে। এমন স্ত্রী যার সারাদিন দৈহিক ও মানুষিক খাটুনি আর দৈনিক আয়ের চিন্তাতলে মুষড়ে থাকে সে স্বামীকে শান্তি ও স্বস্তি পৌঁছানোর বাড়তি ক্ষমতা অবশিষ্ট রাখে কি? উভয়ই যখন একই অবস্থার শিকারে বিরত তখন কে কাকে সান্তনা দেবে, কে কার অনুপ্রেরণা যোগাবে? উভয়ই যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত—তখন কে কার সেবা যত্ন করবে উভয়ই যখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে ব্যস্ত থাকে তাহলে ঘরের ব্যবস্থাপনা আর ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ কে দেবে? উভয়ই যখন কাজে কাজে রুক্ষ ও খিটখিটে হয়ে থাকে তখন কে কাকে আনন্দ যোগাবে, মিষ্ট কথায় কে কার মন ভুলাবে? স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। এমতাবস্থায় একে অন্যের উপর যেমন নির্ভরশীলতার অনুভূতি রাখে না—তেমনি কেউ কাউকে সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালবাসা দেয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না।

বস্তুতঃ গৃহস্থ নারীই কেবল পুরুষকে সান্তনা স্বস্তি ও আনন্দ যোগাতে পারে। এ ধরনের নারী থেকেই পুরুষ পায় নব উদ্যোম ও সজীবতা, পায় উৎসাহ-উদ্দীপনা। এ ধরনের স্ত্রীই স্বামীকে দিতে পারে পূর্ণ তৃপ্তি ও

সন্তুষ্টি। এভাবে পুরুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং শক্তি ও নতুন সাহসের সম্ভারে সে হয় উজ্জীবীত।

বলা বাহুল্য, যখন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে শান্তি ও স্বস্তি অনুপ্রেরণা পাবে না, তখন পুরুষও নারীকে তার কাম্য দৃঢ়তা-সমৃদ্ধি দিতে পারবে না। পারবে না তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। এতে করে দাম্পত্য ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিয়েটাই হয়ে পড়বে অর্থহীন। পুরুষকে বাইরের কাজের এবং নারীকে ঘরের কাজের যে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তার সবকিছু বিশৃংখলা ও অব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়ে পড়বে এভাবে আল্লাহ যে বিধান ঘোষণা করেছেন তার সাথেও সুবিচার করা যাবে না ফলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার জন্যে শাস্তির ভাগিও হতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন—

> ''পুরুষ নারীদের উপর দায়িত্বশীল, এই বৈশিষ্টের বুনিয়াদে যা আল্লাহ ওদের মধ্যে একে অন্যের উপর দান করেছেন, এবং এই বুনিয়াদে যে তারা ওদের জন্যে (মোহর ও ভরণ পোষণের আকারে) নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে।'' (নিসা-৬)

এই হচ্ছে ইসলামের বাস্তবভিত্তিক স্বভাবসম্মত বিধি যা নারীর মধ্যে স্নেহ-মমতা ও ধৈর্যের অনভূতি সৃষ্টি করে আর পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করে গঠন-মূলক কর্মের উদ্দীপনা। এই কারণেই পুরুষ সব সময় নারীর সাহায্য সহযোগিতা করে তার ভরণপোষণ কামনা বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করে। আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে, এসব স্বভাবসম্মত আইন-কানুন ছাড়া পারিবারিক ব্যবস্থা সুসংহত ও স্থিতিশীল হতে পারে না। আর আল্লাহ পুরুষকে পরিববারের দায়িত্বশীল বলে ঘোষণা করে পরিবারের গঠন তার স্থিতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষই হবে হবে পরিবারের প্রশাসনিক প্রধান। সকলের সুযোগ সুবিধে ও প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব তারই এবং পরিবারের সব সদস্য তার সমর্থন ও আনুগত্য করবে। এই হচ্ছে বর্ণিত কোরানী বিধির বাহ্যিক অর্থ। আর এর আধ্যাত্মিক দিক এই যে, মানসিকভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই কোরআনের এই বিধির সাথে একমত

হবে এবং তা মেনে চলবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে উভয়েই বা কোন একজন এই বিধির পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশ নেবে বা পরস্পরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ করবে তখন কোরানী বিধির প্রত্যক্ষ উপকারিতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়বে। এভাবে তারা দাম্পত্য সম্পর্কের সুফল এবং পারস্পরিক সম্মান ও সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

নারীর বাইরে বেরুনো এবং চাকরী করার ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের যদি এমনই অবনতি ঘটে, যদি তারা অন্তরের সুখ-শান্তি ও পারস্পরিক ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে—যদি এর ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিশৃংখলা দেখা দেয়, তাহলে কোন যুক্তিতে বলা যাবে যে নারীর চাকরীতে কোন লাভ হবে বা দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে ? এ ধরণের ধারণা যারা পোষণ করে তাদের কাছে কোন বাস্তব যুক্তি প্রমাণ আছে কি ? আর ইসলামী শরীয়ত এ ধরণের অবাস্তব ও অকল্যাণকর কোন কর্মের অনুমতি দেয় কি ?

তৃতীয় : বর্তমান সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সত্যতা ও যথার্থ কল্যাণকারীতাকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের চাকরীর ফলে যেসব তিক্ত পরিনাম পরিলক্ষিত হচ্ছে তা গোটা দুনিয়ার মানুষের সামনে ইসলামী শিক্ষার সত্যতা স্পষ্ট করে তুলছে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (ECONOMIC INDEPENDENCE) তাদেরকে এতোটা লাগামহীন করে দিয়েছে যে তারা আজ কোন নীতি-নৈতিকতার ধার ধারতে অপ্রস্তুত। আজ পাশ্চাত্যের প্রায় সব যুবক যুবতী বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং কুমারী মেয়েদের গর্ভপাত ও কুমারী মা হওয়াটা পাশ্চাত্যের এক স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, আর চাকরীরতা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সব মেয়ে বা মহিলাই পরপুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েম করাকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলেই বিবেচনা করে। মোট কথা যৌন উশৃংখলা ও সার্বজনীন ব্যভিচারের ফলে গোটা পাশ্চাত্যই আকন্ঠ নিমজ্জিত।

এই নির্লজ্জ পাশবিক উশৃংখলতার পরিণামে যখন ব্যাপকহারে অবৈধ অর্থাৎ জারজ সন্তানের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তারা এটাকে নিজেদের লাগামহীন যৌন

অনাচারের সামনে একটা বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। কারণ-জারজ সন্তানের জন্মের পর তারা অন্তত কিছুদিনের জন্যে বেলাল্লাপনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে,—বারে ক্লাবে আর যত্রতত্র উশৃংখলা প্রদর্শনের সুযোগ থাকে না। সুতরাং এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তারা গর্ভনিরোধের উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। এখন তারা এ ব্যাপারে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে অবাধ যৌন স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের নারীকে এই নতুন চিন্তার প্রতি আকর্ষিত করে তোলে যে, সারা জীবন একই পুরুষের সাথেই কাটিয়ে দেয়ার দরকার কি? অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক বিধি নিষেধেই বা মেনে চলতে হবে কেন? এসব বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করে তো আরো অনেক কিছু অর্জন করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্যের আধুনিক নারী এসব চিন্তার শিকারে পরিণত হয়ে যেসব পথ ও উপায় অবলম্বন করে তারই ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যের গোটা সমাজ মারাত্মক পাপাচার আর যৌন ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্ক ও পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত ধ্বসে পড়েছে। বিয়ে শাদীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং সমাজে অবৈধ জারজ সন্তান এবং কুমারী মায়েদের সংখ্যা বিপুলহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা বাহ্যতঃ বিবাহিত জীবন যাপন করছে তাদের মধ্যেও বহুগামী ও বহুগামীনিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক সমাজে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির বাস্তব ভিত্তিক পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মনীষি সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "পর্দা ও ইসলাম"-এ বলেন,—

"নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি তাদেরকে স্বামী মুখাপেক্ষিতা থেকে নির্লিপ্ত করে দিয়েছে। সেই চিরাচরিত নীতি যে, পুরুষ আয়-উপার্জন করবে আর নারী ঘরের ব্যবস্থাবলী সম্পাদন করবে, তা এখন এই আধুনিক নীতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ই আয়-উপার্জন করবে এবং ঘরের ব্যবস্থাবলী বাজারের এই বিপ্লবী পরিবর্তনের পর উভয়ের জীবনে শুধু এক যৌন সম্পর্ক ছাড়া এমন কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট রইলো না, যা তাদেরকে

পরস্পরের সাথে জড়িত থাকতে বাধ্য করবে। স্পষ্টতই, শুধু যৌন সম্পর্ক এমন কোন বন্ধন নয়, যার জন্যে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে এক স্থায়ী সম্পর্কের বাঁধনে বেঁধে রাখবে এবং একই ঘরে যৌন জীবন যাপনের জন্যে বাধ্য করবে। যে নারী তার নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করে এবং তার সব চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ, জীবনের কোন ব্যাপারে কারো সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষি নয়, সে শুধু যৌন তৃপ্তির জন্যে কেন একটি পুরুষের অনুগত থাকবে ? কেন সে নিজের উপর এতসব চারিত্রিক ও আইনগত বিধিনিষেধ চেপে থাকতে দেবে ? কেন সে একটি পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করবে ? বিশেষতঃ যখন চারিত্রিক সাম্যের ধারনা তার পথ থেকে সেসব প্রতিবন্ধকতাও দূর করে দিয়েছে যা স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আসতে পারে। সে তার যৌন তৃপ্তি লাভের জন্যে সহজ, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দঘন পথ ছেড়ে ত্যাগ তিতিক্ষা ও দায়িত্বের বোঝায় ভারাক্রান্ত সেকেলের (OLD FASHIONED) পন্থা কেন অবলম্বন করবে ? ধর্মের ধারণা বিলুপ্তির সাথে সাথে পাপের চিন্তাও দূর হয়ে গেছে। আর সমাজের ভয় এই জন্যে নেই যে, সমাজ এখন তাকে ব্যভিচারিণী বলে ভৎর্সনা করে না বরং তাকে উৎসাহিত করে। শেষ ভয়টি ছিল জারজ সন্তান জন্ম হবার। তা সে ভয় থেকেও মুক্তির জন্যে রয়েছে গর্ভনিরোধের ব্যবস্থাবলী। এসব গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাবলীর পরও যদি গর্ভধারণ হয়ে যায় তাহলে গর্ভপাতের উপায় রয়েছে। এতেও যদি সফল না হয় তাহলে শিশুকে চুপচাপ হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু হতভাগী মাতৃ অনুভূতি (যা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি) শিশুকে হত্যা করা থেকে বিরতও রাখে তাহলে জারজ সন্তানের মা হয়ে যেতেও কোন বাধা নেই। কেন না, এখন কুমারী মা এবং অবৈধ সন্তানের পক্ষে এতো বেশী প্রচারনা হয়েছে যে, যারা এটাকে ঘৃণার চোখে দেখার দুঃসাহস করবে, তাদেরকেই উল্টো প্রতিক্রিয়াশীল বলে অপবাদ মাথা পেতে বরণ করতে হবে। এই হলো সেই অবস্থা যা পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে।"

চিন্তার বিষয় এই যে, এই পথ অবলম্বন করে যাদের পরিণাম এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আমরা সেই ভুল পথ বাদ দিয়ে কেন আসল পথটি অবলম্বন

করবো না ? কেবল এভাবেইতো আমাদের সমাজ মারাত্মক পরিণতির কবল থেকে বাঁচতে পারে।—যারা অন্যের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সত্যিই ভাগ্যবান লোক। দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর সত্য-সচ্ছ ও সুন্দর পথে পরিচালনা করেন।

—০—

নারীদের অধিকার সম্পর্কে দুটি বড় অভিযোগ

কর্ম—মহিলাদের স্বাভাবিক অধিকার

এই সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মতবিরোধী আপত্তিকারকরা বলে থাকে যে, "কাজ করা নারীর স্বাভাবিক অধিকার।" কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে কথাটির অর্থ বের করা আপনার জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, কাজ করা সম্পর্কে লোকদের ধারণা কি? এই প্রশ্ন এই জন্যেই উঠবে যে, স্বাভাবিকভাবে এই অধিকার মহিলাদের ওসব অর্থনৈতিক অধিকারের মতো নয় যার আইনগত সমর্থন রয়েছে। আর তা এমনও নয় যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তির জন্যে নির্ধারিণ করে রেখেছে। বরং কথাটি ওসব বিধিবিধানের পরিপন্থী বলেই প্রমাণিত হবে এবং ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা তা প্রমাণও করেছি।

মানব স্বভাবের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে আমরা একথা জানতে পাই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনেক রকমের অধিকার রাখে। যেমন মানুষের এটা অধিকার রয়েছে যে, যেহেতু সে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে তাই তার স্বাধীনতার উপর কোন রকমের বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না। কিন্তু কোন বুদ্ধিমানবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিই এই ধরনের লাগামহীন স্বাধীনতাকে কখনো সমর্থন করবে না। একই কথা নারীদের তথাকথিত অধিকার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এটা জেনে রাখতে হবে যে নারীকেও এ ধরনের অযৌক্তিক লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে না যার ফলে তার নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বিপন্ন হতে পারে। শুধু তাই নয়, লাগামহীন স্বাধীনতার ফলে নারী তার আসল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আর তার আসল অধিকার এই যে, সে এক আদর্শ স্ত্রী, মা এবং গৃহকর্ত্রী হবে। এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই। বরং প্রতিটি নারীকে তার এই মৌলিক অধিকার দেয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট নারীর এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়।

এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক যোগ্যতাই মানুষকে কোন অধিকারের উপযুক্ত করে—সেখানে কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে অধিকার সে অর্জন করেছে তা থেকে উপকৃত হবার চেষ্টাও সে করবে। অর্থাৎ অধিকার হচ্ছে এমনই এক ফরয যা থেকে পালিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

মানুষ স্বাধীন ঠিকই। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে তামাশা করার স্বাধীনতা তার নেই। একইভাবে কেউ নিজেকে নিজে অপমানিত করার স্বাধীনতাও পেতে পারে না। অর্থাৎ স্বাধীনতা হবে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক, স্বাধীনতা হবে সার্বজনীন। এখন কি কেউ এমন কোন কর্ম করতে পারবে না যার কারণে তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা হানী হতে পারে। যেমন প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন—

"কোন মুমিনের (জন্যে) এটা উচিৎ নয় যে সে নিজেকে নিজে অপমানিত করে বসবে।"

(ইবনে কাসীর তার তাফসীরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আয়াত এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বোখারী শরীফ থেকে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।) এ থেকে স্বাধীনতা ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং নারী তার নারীত্বের অধিকার নিয়ে যখন কারো স্ত্রী, কারো মা এবং গৃহকত্রীর আসন অলংকৃত করবে তখন তার উপর এই দায়িত্বও বর্তায় যে, সে তার জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীও পূরণ করবে। যাকে আমরা খোদায়ী নির্দেশ বলে অবহিত করে এসেছি। ইসলাম নারীর এসব অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে বিধিবিধান জারী করেছে। এখন সে তার অধিকার এবং দায়িত্ব কোনটাকেই অবহেলা করতে পারবে না এবং এ ধরনের অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শনের কোন অধিকারও তার নেই।

নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ইসলামের এসব নীতি ও বিধির বাস্তবতা অস্বীকার করা কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং কোন নারীর এই স্বাধীনতা বা অধিকার নেই যে, সে তার আসল কর্মক্ষেত্র গৃহ এবং তার আসল দায়িত্ব বাদ দিয়ে চাকরি পেশা অবলম্বন করবে। কারণ এটা

তার আসল অধিকারকেই খর্ব করবে। এ থেকে এখন একথা আরো পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, "বাইরে চাকরি করার অধিকার যেমন তার অর্থ-নৈতিক অধিকার বলে গণ্য নয় তেমনি ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই এবং এটা তার স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তও নয়। এর পরও এটা বলব "নারীর জন্যে বাইরে চাকরি করার অধিকার রয়েছে"? নিছক বাড়াবাড়ি আর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের কথার কোন যুক্তি গত ভিত্তি নেই।

মহিলাদের উৎপাদনশীল ক্ষমতা

যে কোন কর্মের প্রতিফল হিসেবে সুফল ও কল্যাণের প্রত্যাশা করা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তামাদ্দুনিক উন্নতির ভিত্তি প্রস্তর বলে বিবেচিত হয়। এ জন্যেই মহান স্রষ্টা "আল্লাহ যে কোন কর্মের পূর্ণাঙ্গতা সৌন্দর্য এবং শৃংখলাকে বাধ্যতামূলক" করে দিয়েছেন।

(আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ) এবং "আল্লাহ তায়ালা এটা পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দা যখন কোন কাজ নিজের হাতে নেয় তখন তা যেন সুচারুরূপে এবং দক্ষতার সাথে করা হয়।" (হাদীস বায়হাকী শোআবুল ঈমান)

এখন প্রশ্ন ওঠে, কোন দুর্বল বা অনভিজ্ঞ লোক যদি কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে তাহলে যথার্থভাবে সে কাজ করা কি তার পক্ষে সম্ভব? অথচ দৈহিক এবং মানসিকভাবে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম করার মতো কোন যোগ্যতাই তার নেই।

এ থেকে অবশ্য আমরা শুধু এটাই বুঝাতে চাচ্ছিনা যা পুরুষের কর্মক্ষেত্র নারীদের অনুপ্রবেশের ফলে যে বিরাট বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মহিলা-দের চাকরিতে নেমে আসার ফলে যোগ্য ও সক্ষম পুরুষরা চাকরির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু নারীদের চাকরির ফলে কলকারখানার উৎ-পাদন যে হারে কমে গেছে এবং নারীদের অব্যবস্থার ফলে অফিস-আদালতে

যেভাবে স্বাভাবিক কাজকর্মের গতি ব্যাহত হচ্ছে, তার দিকে অবশ্যই আমরা ইঙ্গিত করবো। এ থেকে আজ এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দৈহিক ও মানসিকভাবে দুর্বল নারীদের পক্ষে কোনভাবে ওসব কাজকর্ম করা সম্ভব নয় যা পুরুষের পক্ষে সহজেই সম্ভব। অবস্থা যখন এই, তখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, এসব জেনেবুঝে-দেখেশুনেও কেন নারীদের দুর্বল কাঁধের উপর এতোবড় দায়িত্বের বোঝা চাপানো হচ্ছে? কেন এভাবে জাতীয় উন্নয়নের গতিধারায় মন্থরতার সৃষ্টি করা হচ্ছে? যে কর্ম নারীদের নয়, যা তাদের সাধ্যের বাইরের কাজ তা করার জন্যে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে কেন? এভাবে কি আমরা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি না? অথচ, আল্লাহ্ কোন কাজে অবহেলা ও অদক্ষতার পরিচয় দিতে বারণ করেছেন, কারণ তা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। এবং এ ধরনের উদাসীনতা ও খামখেয়ালির প্রত্যক্ষ পরিণাম হচ্ছে বড়ই মারাত্মক। আল্লাহ্ মানুষকে উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে বলেছেন, মানুষ প্রতিমুহূর্ত সক্রিয় থেকে তাঁর ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করে অগ্রগতির নিত্যনতুন মঞ্জিল অতিক্রম করবে, এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং সেই হিসেবেই আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে বিভিন্ন গুণাবলি ও দক্ষতা দান করেছেন। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মানবতার মুক্তিদূত প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন–

"আল্লাহ যে কোন কাজের পূর্ণাঙ্গতা, সৌন্দর্য্য ও শৃংখলাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।"

এই হাদীস মোতাবেক এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার প্রয়োজন মোতাবেক যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং উপায় অবলম্বন দান করে রেখেছেন। আল্লার দেয়া এই মহান দানের ব্যবহারে সচেতন বা অচেতনভাবে অবহেলা করাটা হবে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট অন্তরায়। তাছাড়া ঐ ধরনের অবহেলা মানব জীবনের একটা কলংক হিসেবেও বিবেচিত হবে। অন্য কথায় আল্লাহর দেয়া যোগ্যতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার বা তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের অর্থ হবে আল্লাহর আইনের অবাধ্যতা।

যাই হোক ঐ নিয়ে বেশী লম্বা-চওড়া কথা বলার প্রয়োজন নেই। চিন্তার বিষয় শুধু এই যে, যখন বস্তুগত উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়ে আসবে। মানুষের উন্নত বাসনা শীতল হয়ে আসবে, মানুষের বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্তও নাকচ হয়ে যাবে, আল্লাহর আইনেরও অমান্য করা হবে তখন ধ্বংস ও অবনতির কবল থেকে মানবতাকে কে রক্ষা করবে? কে তাদের শিক্ষা ও সভ্যতার স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেবে?

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে ইসলামী আইন, ইসলামী জীবনবিধান ও আদর্শের বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা, সহজ সুন্দর এবং ভারসাম্যপূর্ণতা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম মানুষের আয় উপার্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশ দান করেছে, ইসলামের এই ব্যবস্থাটা কত সুন্দর তা লক্ষ করার বিষয়। যেমন ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের পিতার উপরই ন্যস্ত থাকে এবং বালেগ হওয়া পর্যন্ত পিতাই সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্যে দায়িত্বশীল থাকেন। কিন্তু মেয়ে সাবালিকা হবার পরও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতার দায়িত্বে থাকবে এবং বিয়ের পর তার সব দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যাস্ত হবে। স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে আবার তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যাস্ত হবে। মোটকথা নারীকে কখনো তার ভরণপোষণের বা অন্য কোন প্রয়োজন পূরণের জন্যে চিন্তাগ্রস্থ হতে হয় না। এ ব্যাপারে নারীর অধিকার সম্পর্কিত ইসলামের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ওসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে আরো একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি নারীর পিতা, স্বামী বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্বশীল নাও থাকে তাহলেও তাকে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না। কারণ এমতাবস্থায় ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর তার দায়িত্ব ন্যাস্ত করে। সুতরাং সরকার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে তার নিজস্ব তহবিল থেকে এধরনের অসহায়া বা অবলম্বনহীনা নারীর ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব পূরণ করবে।

এই অবস্থা ও পরিস্থিতিকে বোঝার জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধি দরকার এবং এই ভুলধারনার অপনোদন একান্তই অপরিহার্য্য যে, নারী "চাকরী

না করলে উন্নয়নের পথে অগ্রগতি করা যাবে না।" এটা খুবই ভুল ধারণা। আসলে নারীর প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে এই যে তার মানবিকতার মান উন্নীত হবে, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটবে, চারিত্রিক গুণাবলি বাড়বে, সবরকমের মন্দ প্রভাব থেকে মনপ্রাণকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে। এর পরিবর্তে কেউ যদি নারীর উন্নতি বলতে এটা বোঝে যে তারা বাইরে বেরিয়ে চাকরী করবে, দোকানে, দফতরে, কলকারখানায় ও ক্লাবে নাট্যশালায় ঘুরে বেড়াবে তাহলে তাঁরা মারাত্মক ভুলের পরিচয় দেবে। কারণ, নারীর বাইরে বেরুনোতে তার কোন উন্নতিতো নেই-ই বরং তার অপমানও অমর্যাদারই আশংকা বেশী থাকে। বাইরে বেরুনোতে নারীর লাভের চেয়ে ক্ষতি, এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, নারীদের কল্যাণ ও প্রকৃত উন্নতির দিকে আমাদের অনেকেই দূরদর্শিতার পরিচয় দেন না। নারীর নম্রতা, শান্তিপ্রিয়তা স্নেহ ভালবাসা ও মহত্বের মতো উন্নত মূল্যবোধ সমূহকে আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি। নারীর, নারীসুলভ কাজকর্মকেও আমরা যথার্থ গুরুত্ব ও মূল্য দিচ্ছি না। অথচ এসব মূল্যবোধ ও কাজকর্মই নারীকে তার প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা দান করে। অথচ তার এই আসল বিষয়টিকে বিবেচনা না করে, নিছক তার অর্থনৈতিক মুক্তির সস্তা শ্লোগান তোলা হচ্ছে। নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, তার অধিকার ও মর্যাদা এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। নারীর যে আধ্যাত্মিক মান মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে তার তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে আমরা ইমরানের স্ত্রীর সেই মহৎ ও ও মহান মননশীলতার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিলাম, যা মাতৃত্বের এক অমর স্বাক্ষর হিসেবে পবিত্র কোরানের আয়াতে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইমরানের স্ত্রী (হযরত মরিয়মের মা) আল্লার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন—

> "ওগো আমার প্রতিপালক! আমি এই সন্তানকে, যা আমার গর্ভে রয়েছে, তোমাকে উৎসর্গ করছি।" (আলে ইমরান—৩৫)

এই প্রার্থনা থেকে একজন নিঃস্বার্থ মানবতার দরদি মা এবং একজন স্বার্থপর সংকীর্ণমনা নারীর মধ্যেকার বিরাট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। মা তার সন্তানের মাধ্যমে আল্লার সন্তুষ্টি ও মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ কামনা করে আর একজন

বিভ্রান্ত বস্তুপূজারী নারী তার সন্তানের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে টাকা কয়েকের মজুরীর জন্যে নিজের নারীত্বকে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়। একজন আদর্শ স্ত্রী, মা ও গৃহিনী তার অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও সন্তুষ্ট। আর অন্য একজন নারী তার অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে নিজের এবং অপরাপর মানুষের জীবনকে করে তোলে বিড়ম্বনাময় ও বিপদগ্রস্থ।

আজকের আধুনিক নারীর এই অধঃপতনের সমস্যা কোন জাতি বিশেষের সমস্যাই নয় বরং এর বিষাক্ত প্রভাব গোটা দুনিয়ার সর্বমানবতাকে আক্রান্ত করে ছেড়েছে। সুতরাং এর সমাধান ও সত্যিকারের ভার ব্যক্তিবর্গের উপর ছেড়ে না দিয়ে সামষ্টিকভাবে সব মানুষকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। কারণ ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নর হোক বা নারী কিছুটা, স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। সে তার ব্যক্তিগত লোভ কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে বেশী থেকে বেশী টাকা উপার্জনের জন্যে লালায়িত থাকে। তাছাড়া এমন কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করে-নারীদের উপর বাড়তি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেদের অপরাধী মুখ ঢাকা দেয়ার জন্যে বলে থাকে যে, "নারীর চাকরী করাটা আজকের সামাজিক প্রয়োজন।" তাদের মতে "নারীর চাকরী করা ছাড়া নাকি জীবন অপূর্ণ থেকে যায়।" আসলে এ ধরনের কথা কেবল লোভী-স্বার্থপর শ্রেণীর ধাপ্পাবাজরাই বলে থাকে। তাদের কথা অনুযায়ী যদি নারীকে চাকরীর বাহানায় লাগামহীন ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে উন্নত গুণাবলী সম্পন্না ও চরিত্রবতী স্ত্রী অথবা মা সৃষ্টি হবে কোথা থেকে ? পরিবারের সংরক্ষিকা তত্বাবধায়িকা ও সমাজ সংস্কারিকা মা আসবে কোথকে ? ওধরনের আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা ছাড়া উন্নত ও পবিত্র সমাজ সভ্যতার বিকাশ ঘটবে কেমন করে ? সুতরাং আমাদের প্রস্তাব হচেছ নারীর স্বার্থে তথা মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে, ইসলামী শিক্ষার আলোকে, দুনিয়ার রাষ্ট্র ও সরকার সমূহকে এই সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ এবং প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ।

এক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার যেসব বাস্তবানুগ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তা থেকে বিরাট সহায়তা নেয়া যেতে

পারে। বস্তুতঃ ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করেই নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য যাবতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বামী, পিতা, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করে রেখেছে। যেন কোন রকমের অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় নারীর আসল দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখা না দেয়। নারী তার সন্তান ও পরিবারকে উত্তম গুণাবলীতে গড়ে তোলে শুধু তার নিজ পরিবারের উপকার করে না বরং এ থেকে সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা বিশ্বমানবতাই উপকৃত হয়।

এ প্রসংগে চমৎকার ব্যাখ্যা দান প্রসংগে মিসরের বিখ্যাত প্রগতিবাদী সাংবাদিক আনিস মঞ্জুর আল-আখবার পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেন,— "দাম্পত্য জীবনের সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, আমরা এসব কর্মকে কোন কর্ম বলেই বিবেচনা করি না। অথচ আসলে এটাও অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশিক্ষণিক ও মানসিক কর্ম এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতে তো এখন এ জন্যে নিয়মিত পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে কারণ তারা গৃহের কাজকর্ম করে। সেদিন আর দূরে নয়, যখন আপনারা দেখবেন যে, নারীকে চাকরি অথবা সন্তানের লালন-পালন উভয় কর্মের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হবে যে, সে এর যে কোন একটা গ্রহণ করতে পারে। তখন আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে নারী সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বটাকেই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততও করবে না।

বস্তুতঃ মানবতার ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও শান্তিময় রাখার একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে, নারীকে তার আসল মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, তাকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে কতোটা উন্নত ও অধিকতর উপকারী। আর এই সামষ্টিকভাবে সকল মানুষকে, মানবিক গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জনের জন্যেও এটা জরুরী যে তারা উভয়ই নর ও নারী হিসেবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান করে নিজের নিজের অধিকার, মর্যাদা, গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে উভয়ের গুরুত্বই বরাবর।

পরিশিষ্ট

তথাকথিত আধুনিকতার শিকারে পরিণত হয়ে কি নারী নিজের সাথে সুবিচার করেছে ?

এখানে আধুনিকতা বলতে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন এ জন্যেই অনুভব করছি যে, আমরা মানি বা নামানি—একথা সত্য যে আজকাল ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত একশ্রেণীর মুসলিম নারীও এই তথাকথিত আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে নিজেদের ফ্যাশনে পরিণত করে নিয়েছে। তারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদেরকে পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যের বর্ণে বর্ণিত করার ব্যাধিতে ভুগছে। এই ব্যাধিতে আরো আকর্ষণীয়ভাবে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে কতিপয় অপরিনামদর্শী সাহিত্যিক। এরা বিশেষ করে যুবক-যুবতিদের পাশ্চাত্য প্রীতির তালিম দিয়ে থাকে এবং পাশ্চাত্যের যে কোন রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরার জন্যে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে। পাশ্চাত্যের উৎকট ভোগবিলাস ও ফ্যাশনপ্রিয়তাকেই এরা আধুনিকতার ছদ্মনামে পেশ করে। এর কারণ এবং এসব পন্ডিত সাহিত্যিকদের মানসিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন এখানে নেই, কিন্তু তারা পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণ শিখিয়ে মুসলিম জাতির কতো বিরাট ক্ষতি যে করেছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তারা নিজেদের হীনমন্যতা ও বিকৃত মানসিকতার আড়ালে প্রগতিশীলতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বাহানায় নবীন যুবক-যুবতিদের পাশ্চাত্যের নির্ভেজাল নোংরামীর বীজ ঢুকিয়ে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের মূলে যে কুঠারাঘাত করেছেন, তা তাঁরা অবশ্যই জানেন এবং জেনে-বুঝেই তাঁরা এই অপকর্মে লিপ্ত রয়েছেন।

এই আলোচনায় আমরা পাশ্চাত্যের নারীর ক্রমবিকাশ, তার কারণ ও উপায় তার ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত পেঁৗছার জন্যে তাকে যে সব স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে তা নিয়েও আমরা আলোচনা করতে যাবো না, আমরা বরং পাশ্চাত্যের নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা নিয়েই আমাদের আলোচনাকে সীমিত রাখবো। আমরা এখানে দেখতে চাইবো যে, তারা কি সত্যিই সেই লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছে যা তাদের স্বভাব ও মানবিকতার দাবী

ছিল ? তারা কি তাদের নারীত্বের অধিকার পেয়েছে ? এবং তারা কি তাদের নারীত্বের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছে ? নাকি বুনো ঘোটকীর মতো নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও দায়িত্বকে পদদলিত করছে। এখানে আমরা তাদের মধ্যে নম্রতা, শালীনতা, শিষ্ঠতা ও লজ্জার অভাবের প্রসংগও তুলবো না এবং পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে নেমে কি পেরেছে কি হারিয়েছে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু বলবো না। কারণ এতেকরে আলোচনা বিলম্বিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া এসব প্রশ্নের অনেক জবাব আপনারাও জেনে থাকবেন যা আমরা ইতি-পূর্বে জানিয়ে এসেছি। তবে আমরা এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার অবতারণা অবশ্যই করবো।

প্রথম বাস্তবতা ঃ

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে তাদের লাগামহীন স্বাধীনতা। এই উশৃংখল স্বাধীনতার ধারণা হচ্ছে অষ্টাদশ শতকের উৎপাদন। পরে শিল্প, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবাদি এই লাগামহীনতাকে আরো উৎসাহিত করে, ক্রমে বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের নারীদের এই লাগামহীনতা চরমরূপ ধারণ করে।

ক্রমে যুগের পরিবর্তন ঘটে। খৃষ্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের গোঁড়া প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্রের অমানুষিক জুলুম নির্যাতনের ফলে গোটা পাশ্চাত্য জগৎ মানবাধিকারের শ্লোগানে কেপে ওঠে। প্রচলিত মানমর্যাদা, ভদ্রতা ও উদারতার অর্থ বদলে যায়, বদলে যায় মানুষের ব্যবহার ও অভিরুচি। গোটা পাশ্চাত্য-বাসী ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখর হয়ে উঠে। খৃষ্ট ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে তারা বিকল্প জীবন ব্যবস্থার অন্বেষণে সচেষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুগ সন্ধিক্ষণে তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে পরিচয় লাভ করতে পারেনি। ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনদর্শন প্রণয়নে ব্রতী হয়। যেহেতু তাদের এসব জীবনদর্শন ছিল খৃষ্টধর্ম ইহুদী ধর্মের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বাস্তব ফসল। তাই তারা চরম বস্তুবাদী পথই অবলম্বন করে, ফলে তারা আগের চেয়েও ভয়ংকর ও বিধ্বংসী পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়।

এই নয়। বস্তুবাদী বিপ্লবের সয়লাবে নারী-পুরুষ সবাই একাকার হয়ে যায়। ধর্মকে তারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এবং লজ্জাশরম, সম্মান, শালীনতা, পবিত্রতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী তাদের কাছে একান্ত অর্থহীন কথা বলে মনে হয়। জড়বাদী বিপ্লবের এই হুজুগী স্রোতে নারী তার নারীত্বকে বর্জন করে গা ভাসিয়ে দেয়। অবাধ মেলামেশা, সামষ্টিক বিলাস আনন্দ আর নাচগানের যৌথ সরগরমে তারা হয়ে ওঠে ব্যস্ত উদ্বেলিত। নাচ-গান আর মদের আড্ডায় তারা হয়ে উঠে মাতাল পুরুষের সম অংশীদার। এখন তারা যে কোন পুরুষের সাথে অবাধ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হতে আর ইতস্ততঃ বোধ করে না বরং এই লাগামহীন ব্যভিচার আর বিলাসমত্ততাই হয়ে ওঠে সকলের প্রিয় ফ্যাশন। পাশ্চাত্য সমাজে অবাধ ব্যভিচারের এই কলংকজনক ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে জর্জ রয়লী স্কট তাঁর গ্রন্থ A HISTORY OF PROSTITUTION (বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস) এ লিখেছেন—

> "তার কাছে জীবনের আনন্দ এই যে, যৌবনে যৌন সুধার পেয়ালা আকণ্ঠ পান করা হবে। এরই সন্ধানে সে নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরা ইত্যাদির চারদিকে ঘুরতে থাকে, এরই সন্ধানে সে অপরিচিত পুরুষের সাথে মোটর-ভ্রমণে যেতেও সম্মত হয়। অন্য কথায় সে জেনে বুঝে নিজের কামনার তাগিদে নিজেকে নিজে এমন পরিবেশ ও এমন অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয় এবং অন্যকেও পৌঁছায় যেখানে যৌন উত্তেজনাকে উস্কে দেয়ার মতো লোকেরা অবস্থান করে এবং এরপর তার যে স্বাভাবিক প্রতিফল দেখা দেয় তাতে সে শংকিত হয় না বরং তাকে স্বাগত জানায়।"

এটা এমন এক খোলা বাস্তবতা যা কেউই অস্বীকার করে না। এবং এটাই হচ্ছে সেই অবাধ স্বাধীনতা যা পাশ্চাত্যের নারী পুরুষ সমানভাবে ভোগ করছে। তাদের মতে ব্যক্তিগত জীবনে কিছু করা না করার ব্যাপারে প্রতিটি নর-নারীই স্বাধীন। তারা যে কোন নৈতিক ও চারিত্রিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে যা মর্জি তা করার অধিকার রাখে। ভালমন্দ যা খুশী তা তারা করতে পারে। এ ব্যাপারে বাধা দেয়ার বা কিছু বলার কোন অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্রের নেই।

তবে সরকার কেবল সে সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে যেখানে সামষ্টিকতার স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে বলে মনে হবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা :

দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সাম্যের ভুল ধারণা। এই ভ্রান্তি নারীকে তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন এবং অস্বীকারকারী নীতি করে ছেড়েছে। এর পরিবর্তে সে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এখন সে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বর্জন করে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর অধিকার দাবী করছে এবং এখন নারী অধিকার বলতে পুরুষের অংশের অধিকারই বুঝায় এবং তারই জন্যে সর্বত্র চেঁচামেচি ও সংগ্রাম করে বেড়াচ্ছে।

নর-নারীর সাম্য বলতে পাশ্চাত্যের জড়বাদীরা এটা মনে করে নিয়েছে যে, শুধু নৈতিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব কর্মেই তারা পুরুষের বরাবর ও সমান অংশীদার। পুরুষ যে কাজ করবে— নারীও সেই কাজ করবে। সুতরাং পুরুষ যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে নারীও সেই একই শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে এখন নারীই সেসব কাজ করছে যা কখনো কেবল পুরুষেরই কর্তব্য ছিল। বলাবাহুল্য আজ পুরুষের মতো নারীও ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষক, আইনবিদ ইত্যাদি অন্যান্য কর্মেও অংশীদার পাচ্ছে। এখন নারী ও পুরুষ বলতে তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। এখন তারা সরকারী ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পূর্ণ সমানাধিকার দাবী করছে— যেখানে তারা এখনো নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য বর্তমান রয়ে গেছে বলে মনে করে।

পুরুষের কাজকর্মে আগ্রহী হবার ফলে নারী তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছে। সুতরাং তাদেরকে কোথাও দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নয়ন বা পারিবারিক দায়িত্ব পালন অথবা মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণের জন্যে কোন প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলতে শোনা যায় না। কিন্তু

নৃত্যশালা, নাট্যশালা, সিনেমা, ক্লাব ইত্যাদি স্থাপনের তৎপরতায় তাদেরকে বড্ড ব্যস্ত দেখা যায় এবং তাদের এসব তৎপরতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অবশ্য আমরা নারীদের প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন কুটিরশিল্প, খাদ্য-প্রস্তুত, পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করার প্রশিক্ষণ ও এ ধরনের গঠনমূলক তৎপরতার বিরোধিতা করছিনা। কারণ স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ; এর জন্যে তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কারণ গঠনমূলক প্রশিক্ষণই আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মাকে পরিবার ও সমাজ গঠনের ভূমিকা পালনের কৌশল ও দক্ষতা দান করে। কেবল রান্নাবান্না ও সেলাই করে স্ত্রী বা মায়েরা তাদের সেই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। সুতরাং তাদেরকে আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা হিসেবে যোগ্য ও সক্রিয় করে তোলার জন্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া একান্তই জরুরী।

কিন্তু এই কাজের এতো বেশী প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকা সত্বেও আধুনিক নারী কক্ষনো এর জন্যে দাবী তোলেননি। তারা নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথায় ভীষণ অসন্তুষ্ট। কিন্তু যদি তাদেরকে একথা বলা হয় যে, ভবিষ্যতে তাদেরকে আর সন্তান ধারণ, তাদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণাদী দিতে হবে না—তখন তারা সেই অনাগত ভবিষ্যতকে স্বাগত জানাতে মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব করে না।

নিজেদের স্বাভাবিক দায়িত্ব তাদের এই নির্লিপ্ততা এবং পুরুষদের সাথে এতো বেশী ঘনিষ্ট মেলামেশা এ কথারই পরিচায়ক যে নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কে তাদের ধারণাই নাই। এটা তাদের এক ভয়ংকর মানসিক দুর্বলতারও ইঙ্গিতবহন করে যে সে তার নারীত্বকে নিয়ে লজ্জা ও হীনমন্যতা-বোধ পোষণ করে এবং পুরুষ হয়ে জন্মায়নি বলে আক্ষেপ করে। যেহেতু প্রকৃতি তাকে পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করেনি তাই সে অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে কৃত্রিম পুরুষের বেশ ধারণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, সে এই মানসিকতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সম্ভব সবরকমের উপায় অবলম্বন করে যেন তার "অবশ্য কামনা" সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু তাও কি সম্ভব ? নারী, নারীই

থাকবে—সে যতই অনুকরন করুক আর যতই কৃত্রিমতা অবলম্বন করুক না কেন। কিন্তু সে যদি নারী হিসেবেই নিজের মহত্তম লক্ষে পৌঁছুতে চায় তাহলে এতো সব অনুকরণ আর কৃত্রিমতার কোন প্রয়োজনই নেই।

উদাহারণ স্বরূপ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত দাবির কথা ভেবে দেখুন এবং বলুন যে, আসলে কি এটা তেমন কোন জরুরী বিষয় যার জন্যে তারা এতো হৈ-হল্লা করেছে? এতে করে বরং পুরুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা নারীদের এই দাবীকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন সরকারের উৎখাত করে নয়া বিপ্লবী সরকার কায়েম করে। এভাবে তারা নারীও পুরুষের মধ্যেকার সম অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই শুধু করেছে। নয় কি?

বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন দেশের নারী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হবার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এই সুযোগ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কীন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে অনেক আগে থেকেই রাখা হয়েছে। কিন্তু সেসব দেশে সবরকমের সুযোগ থাকা সত্বও পুরুষদের তুলনায় নারীদের পার্লামেন্টর সদস্যাপদ প্রার্থীনী-দের অনুপাত হচ্ছে শতকরা মাত্র আড়াইভাগ। অথচ দুনিয়ার প্রতিটি দেশে প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় বরাবর হয়ে থাকে। সেদিক থেকে, পার্লামেন্টে সদস্যাপদ প্রার্থীনিদের অনুপাত পুরুষের বরাবর হওয়াই উচিৎ ছিল—যখন তার পূর্ণ সুযোগও রয়েছে।

অণ্যদিকে আধুনিক নারী সাধারণ যানবাহনে তাদের জন্যে নির্দ্ধারিত কক্ষ বা আসনের পরিবর্তে পুরুষের সাথে একই আসনে বসার সুযোগ দেয়ার দাবী করার পেছনে যুক্তি বা অর্থ কি? আর তারা তাদের জন্যে পৃথক কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দাবী না করে পুরুষের সাথে কলেজ বা বিশ্ব বিদ্যালয় সম অধিকার দাবী করার অর্থইবা কি?—আধুনিক নারী নারীসুলভ পোষাক পরিচ্ছেদের পরিবর্তে পুরুষের মত প্যান্ট-শার্ট পরার নির্লজ্জ আকাংখা পোষণ করে কোন্ মানসিকতায়? এভাবে অন্যান্য সব ব্যাপারেও তারা পুরু-ষের অনুকরণ করতে চায় কেন? ইদানিং তারা লিখনে ও বলেন স্ত্রীলিংগের ব্যবহার বর্জন করারও দাবী তুলছে? তারা বলনে ও লিখনে নিজেদের জন্যে

পুংলিংগ ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু কেন ? তথাকথিত আধুনিক নারী-দের এসব দাবী ও কথাবার্তায় এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে নারী হওয়াটা যেন কোন লজ্জা বা দুর্ভাগ্যের কথা। তারা নারী হয়েছে বলে নিজেদেরকে হীনতরভাবে। আর তাই পুরুষের বরাবর হবার জন্যে তাদের এই অস্বাভাবিক চেষ্টা সাধনা।

তথাকথিত আধুনিক নারীর উন্নতির অর্থ বোঝার জন্যে উপরে বর্ণিত দুটি বাস্তবতাকে সামনে রাখা দরকার। অর্থাৎ লাগামহীন স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সমক্ষেত্রে সমানাধিকার-এর দৃষ্টিকোণ থেকে—মানুষ হিসেবে অথবা নারী হিসেবে তারা কি উন্নতিটা করেছে ? আর নারীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং স্বাভাবিক কাজকর্মের বাস্তবায়নেই বা তারা কতটুকু উন্নতি অর্জন করেছে ?

লাগামহীন স্বাধীনতার অর্থ এবং বাস্তব অবস্থার প্রামান্য চিত্র আমরা উপরে তুলে ধরেছি। আমরা দেখেছি যে এই লাগামহীন স্বাধীনতা নারী ও পুরুষকে অবাধ যৌন উশৃংখলা এবং নির্লজ্জ-ফ্যাসন-বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। আর তাদের স্বাধীনতার অর্থ কি ? কার কাছ থেকে কিসের স্বাধীনতা ? তাদের স্বাধীনতার অর্থ শুধু এই যে-তারা বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে স্বাধীনতা চায়, তারা মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে স্বাধীনতা চায়, তারা সন্তানের লালন-পালন এবং প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব থেকে স্বাধীনতা চায়।

স্মরণযোগ্য যে, দীর্ঘকাল ধরে নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্রিয় ছিল। গত শতকের শেষ এবং চলতি শতকের প্রথম দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলছিল। এর পর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ আকাশে এই শ্লোগান ছাড়ে যে নারীকে তার আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আধুনিক যুগের পুরণে এগিয়ে আসতে হবে। এটা তাদের এই শ্লোগানকে দার্শনিক রূপ দেয় এবং আধুনিক জড়বাদী চিন্তাবিদদের মন্তব্যের আলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। তারা অশ্লীলতা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য নোংরামীকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আধুনিক নামে নামকরণ করে। কিন্তু তবুও সাধারণভাবে নারীরা তাদের প্ররোচনায় কান দিতে ইতস্ততঃ করে। কারণ এতোদিনের নারী

সুলভ সংস্কারবোধ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জতার সাথে হাত মিলাতে বাধা দেয়। কিন্তু দু'দুটি মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট পরিবেশ নারীদের সেই শেষ ইতস্ততঃবোধকেও শেষ করে দেয় এবং তাদেরকে খোলাখুলি যৌন নোংরামী ও আধুনিক পাশবিকতার চরম পর্যায়ে টেনে আনে।

সুতরাং আজ এই লাগামহীন স্বাধীনতা আর সাম্যের অস্বাভাবিক ভুল ধারণাই পাশ্চাত্যে বিয়ের সম্পর্ককে একেবারে অর্থহীন ও ঠুনকো করে দিয়েছে। কারণ নিছক যৌন মিলন ছাড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর কোন সম্পর্কই বর্তমান রাখা হয়নি। দাম্পত্য সম্পর্ককে সুন্দর ও স্থিতিশীল রাখার সব বুনিয়াদকেই তারা উল্টে দিয়েছে। তাদের যত্রতত্র অবাধ প্রেম-ভালবাসার ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার প্রেম-ভালবাসার সব সম্পর্ককে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন তারা বিয়ে ছাড়াই যে কোন পুরুষের সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এভাবে তারা বিয়ে ছাড়াই জীবনের আনন্দ সম্ভোগ করতে পারে। গর্ভনিরোধের ব্যাপক সুবিধে রয়েছে বলে জারজ সন্তানেরও দুশ্চিন্তা নেই।—শতাব্দীর মহান মণীষী সাইয়েদ মওদূদী তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ "পর্দা ও ইসলাম"-এ পাশ্চাত্যের এই ভয়াবহ অবস্থার অনেক প্রামান্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি DETROIT-এর বিখ্যাত পত্রিকা FREE PRESS-এর একটি রিপোর্টও তুলে ধরেন। তাতে বলা হয়েছে—

> "বিয়েশাদীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া, তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিয়ে ছাড়াই স্থায়ী ও অস্থায়ী অবৈধ যৌন সম্পর্কের সংখ্যাধিক্যে একথাই প্রমাণ করে যে আমরা পাশবিকতার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং সন্তান উৎপাদনের স্বাভাবিক বাসনা বিলোপ পাচ্ছে।"

অন্য এক স্থানে সাইয়েদ মওদূদী মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি লিন্ডসে-র মন্তব্যের উল্লেখ করেন। তাতে তিনি মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মেয়েদের অভিমতকে ব্যক্ত করেন এই ভাষায়—

"আমি বিয়ে করবো কেন? আমি মনে করি এ যুগের মেয়ে ভালবাসার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্রিয়ার স্বাভাবিক অধিকার রাখে। আমরা গর্ভনিরোধের অসংখ্য উপায় জানি। এ ভাবে জারজ সন্তান জন্মানোর আশংকা ও দূর করা যেতে পারে। ফলে কোন জটিল অবস্থার ভয় নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত পন্থাগুলোকে এই আধুনিক পন্থায় বদলে দেয়াটা বুদ্ধির দাবীরই অনুকূল।"

আর এ ধারণা পোষণকারিনী নির্লজ্জ নারীদের জন্যে পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খোলা রয়েছে। তাদের এই নির্লজ্জ স্বাধীনতাকে রুখে দেয়ার অধিকার আইনকানুন বা সমাজ সরকার কারুরই নেই। কেউ তাদের নিন্দা সমালোচনাও করতে পারে না। কেন না স্বয়ং তাদের সমাজ আর সরকারই তাদেরকে যথেষ্ট ব্যভিচারের সেই অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে।

পাশ্চাত্যের বর্তমান চরমপন্থী স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও বিধানকে অনেকটা কঠিন মনে হতে পারে। কারণ ইসলাম লাগামহীন স্বাধীনতার অনুমতি দেয় না বরং এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্পষ্ট অবগতির জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাপক অধ্যয়ণ করা জরুরী। ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই স্বাধীনতা দান করেছে এবং প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তারা নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীন। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে ও দায়িত্বে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশের কোন স্বাধীনতাই কারো নেই। কারণ এ ধরণের অবাধ স্বাধীনতা চরম বিশৃংখলারই সৃষ্টি করে। যেমন পাশ্চাত্য সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে :

ইসলামের বিধি ও ব্যবস্থা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে আমাদের পূর্বপুরুষরা এর কার্যকরীতা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

ইসলাম, স্বামীকে স্ত্রীর ধনসম্পদ, অভিমত, এবং ধর্মীয় মতামতের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়নি এবং স্বামীকে এমন কোন কথাবলার বা কাজ করার

অধিকার দেয়া হয়নি যাতে করে স্ত্রীর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অবসান হতে পারে। এমনকি ইসলাম স্বামীর নাম যোগ করতে হবে। অথচ পাশ্চাত্যের এর সাধারণ প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এই প্রচলনটা যদি ইসলামী সমাজেই কেবল থাকতো তাহলে এসব লোকেরাই কতোনা অকথা বলে বেড়াতো এবং ইসলামের ব্যাপারে নাক সিঁটকাতো, একে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে সমালোচনা করতো। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই এই কু-প্রথার অনুসারী বলে-এটাকে মন্দ না বলে বরং ফ্যাশন বলেই চালিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য কথা! ইসলামের ভালো কথাটাও তাদের কাছে বিবেচনার অযোগ্য আর তাদের সব মন্দ কার্য্য কলাপই ফ্যাশন ও অভিজাত্য বলে বিবেচিত হয়!

কিন্তু ইসলাম নারীকে তার আসল অধিকার দান করেছে, ইসলাম তাদের যে অধিকার দিয়েছে সে অনুসারে কোন স্বামী তার স্ত্রী ধনসম্পদ, মতামত ও ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনরকমের হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যে ভিত্তি রচনা করেছে তাকে যে কোন অর্থে উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। যদি কোন স্বামী কোনভাবে স্ত্রীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং স্ত্রী যদি ইসলামী আইন মোতাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করে তাহলে তাকে অবশ্যই সুবিচার দিতে হবে। এভাবে নারীর উপর কোন রকমের জোরজুলুম বা শোষণের কোন অবকাশই রাখা হয়নি। ইসলাম সমাজ ও সরকারকে নারীর ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও তার সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যাবহার করার আদেশ দিয়েছে এবং তাকে তার সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছে।

কিন্তু দুনিয়ার নারী সমাজ ইসলামী আদর্শের অনুসরণ না করে নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে। আজ তারা জীবনের বৃহত্তম লক্ষ্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পুরুষের সাথে বিড়ম্বনাময় ঘানি টেনে ফিরছে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তারা আদর্শ নারী হবার মৌলিক গুণাবলী থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা আজ পুরুষের অনুকরণ ও পুরুষের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির দাসীবৃত্তি করাকে নিজেদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছে।

তারা পুরুষের বেশ আর পুরুষের কর্ম লাভকেই মনে করে সমতার অর্থ।

নারী কি যুগের সাথে সুবিচার করছে! তারা কি অতীত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াতেই, মুক্তির নামে আজকের এই চরমপন্থা খুঁজে বের করার অভিনয় করচে না? —আক্ষেপ! তারা ভুলের পর ভুলই করে যাচ্ছে। তাদের এক একটি ভুল সিদ্ধান্ত থেকে জন্ম নিচ্ছে আরো অসংখ্য ভুল।—তারা যদি সত্যিই মুক্তি চাইতো, সত্যি সত্যিই যদি তারা সুবিচার চাইতো, চাইতো যদি তারা তাদের ন্যায্য অধিকার—তাহলে তারা সে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা অবশ্যই করতো যা ইসলাম তাদের শিখিয়েছে। ইসলামের এসব শিক্ষা ও নীতিমালা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি।

বস্তুতঃ সমাজ-সংস্কার ও সংগঠণ এবং উন্নত উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে যথার্থ মর্যাদা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ইসলামী নীতি ও শিক্ষার বাস্তবায়ন একান্তই অপরিহার্য।

"অধিকারের সাম্য" দাবী করার অস্পষ্ট শ্লোগানের আড়ালে নারীর প্রকৃত অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। নারী জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে নারীর প্রতি সুবিচার প্রদর্শন কল্পনা সম্ভব নয়। তাছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কল্পনো সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়।

জানি, স্ব-ঘোষিত প্রগতিবাদী ও আধুনিকতাবাদীদের কাছে কোন প্রশ্নরই যুক্তিসঙ্গত জবাব নেই এবং কোন সমস্যার সমাধানও নেই। তারা কেবল সমস্যাকে জটিলতর করতেই ওস্তাদ। তাই কোন বাস্তব ভিত্তিক নীতি ও যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে আমাদের সেকেলে প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়া বলে গালি দিয়ে আত্মতুষ্টি অর্জন করে।

তারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে প্রচার করে। কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, প্রগতির অর্থ কি? তখন তারা শুধু এটুকুই অর্থ করে যে প্রগতি মানে শিক্ষা ও বস্তুগত উন্নতি। এছাড়া তারা আর কোন উন্নতির

কথা ভুলেও মুখে আনে না। কারণ তারা জানে যে আসল অর্থ করতে গেলে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হবে ও বেকায়দায় পড়তে হবে।

প্রগতির বিভ্রান্তিকর শ্লোগান তুলে তারা শুধু সমাজের বুকে জড়বাদী ধারণার বীজ বুনতেই সচেষ্ট। তারা প্রগতির ব্যাখ্যা দিতে চায় না এই জন্যে যে, তারা জানে তারা বলছে ও করছে তার সাথে প্রগতির কোন সম্পর্কই নেই। তারা প্রগতির যে ঠুনকো মানে করে তা একান্তই বিভ্রান্তিকর। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের মুখোস লুকোবার জন্যে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত উন্নতির গালভরা বুলি আওড়ায়। তারা খুব ভাল করেই জানে যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিত্য নতুন অধিকার—উদ্ভাবন ঘটেছে তেমনি তা ঘরের নারীকে বাইরে এনে পুরুষের সাথে কলকারখানায় জুড়ে দিয়েছে। নারী তার নারীত্ব হারিয়ে পরিণত হয়েছে পুরুষের পোষণ ও সম্ভোগের কাঁচাদ্রব্যে। এটাই হলো তাদের প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার অর্থ।

তা একবার যখন নারীকে ঘর থেকে বের করে উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে সে এখন আর ঘরে বসে স্বস্তি পাবে কেন? আর চরে বেড়াবার এতো বিরাট ময়দান পড়ে থাকতে সে বিয়ে করে ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যই বা করতে যাবে কেন? যৌন তৃপ্তি লাভের কোন অসুবিধে তো আর এমনিতেই নেই। বিয়ে ছাড়াও তা যে অনায়াসে ভোগ করতে পারে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মুক্ত নারী মুক্ত সমাজের বুকে এই ভাবেই জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এই এই হচেছ তাদের প্রগতিশীল জীবনের দর্শন। এসব গোলকধাঁধাঁ আর ভ্রান্তির মায়াজালে ঘটে চলছে যত অনাচার-অঘটন।

এই তথাকথিত প্রগতিশীলতার পেছনে কেটে যাচ্ছে তাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবন। তারা এখন তাদের সামাজিক ও সরকারী আইনের ছত্রছায়ায় জারজসন্তান জন্ম দেয় এবং এসব জারজ সন্তানকে লালন-পালন করার জন্যেও তারা বাধ্য নয়। এই হচ্ছে পাশ্চাত্যের সাধারণ সমাজচিত্র। এরই গুণগান প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাদের রথী-মহারথীরা। এটাই নাকি উদার নীতি, প্রগতি আধুনিকতা আর উন্নত মননশীলতা! এই নোংরামীর দূষিত বিষাক্ত পরিবেশেই তাদের প্রগতি সহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে—গোটা বিশ্বময়।

নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের সংস্থালংঘন করে বাইরে ঘুরে বেড়ালে যে সামাজিক সমস্যাবলির সৃষ্টি হয় তাতে দ্বিমতপোষণের কোন উপায় নেই। রইলো শিল্পোন্নয়নের কথা। তা শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বকে অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠেনা, একইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন ও মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। ইসলাম শিল্পোন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। পবিত্র কোরান ও প্রিয়নবীর হাদীস মোতাবেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভাবন এবং সামগ্রিক অর্থ-শিল্পোন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একইভাবে সভ্যতার বিকাশ-সাধনও ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভা দান করেছেন এই জন্যে যে তারা আল্লার এই পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থকে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যবহারাধীনে আনার চেষ্টা সাধনা করবে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক বিবেচনার শক্তি-দান করেছেন। এজন্যে ইসলাম সর্বোতভাবে উন্নয়নের সমর্থক। মানুষ তার বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করুক ইসলাম তাই কামনা করে। এজন্যে ইসলাম ইতিবাচক ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনা-ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম, মানবতার যথার্থ উন্নয়ন ও বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে নর ও নারীর কর্মক্ষেত্র এবং তাদের মেধা ও ক্ষমতা মোতাবেক দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছে যাতে করে তারা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকভাবে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

কিন্তু ইসলামের এই সহজ সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে যারা নারীকে পুরুষের সাথে খাপছাড়া প্রতিযোগিতায় নামানোকেই উন্নতি ও প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করে তাদের জ্ঞান-বিবেক ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এ ধরনের অপরিণামদর্শী ও অসৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকেরাই নারী তথা গোটা বিশ্বমাণবতার নিকৃষ্টতম শত্রু। এমন মূর্খ ও ভোগবাদী শোষকগোষ্ঠীর হীন চক্রান্ত থেকে বিশেষভাবে নারী সমাজকে এবং সাধারণভাবে গোটা মানবতাকে মুক্ত করানোর সময় এসে গেছে।

আর সমাজকেও এটা বুঝে নিতে হবে যে. কলকারখানা অফিস আদালত আর দোকানপাটে খেটে খাওয়ার নাম উন্নতি নয়। যারা এটাকে উন্নতি মনে করে তারা আসলে উন্নতির অর্থ'ই বোঝে না, অথবা জেনেশুনেই ভাল অর্থ করে।

বলুনতো, চাকুরীরতা নারীরা যদি চাকুরীতে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি উন্নতির গতি রুখে যাবে? তারা বাইরে না বেরুলে বাইরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে কি? বরং বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব জায়গায় নারীরা কাজ করে না সেখানে উৎপাদন উন্নতি তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। আর যেসব জায়গায় নারী কাজ করে সেখানকার উৎপাদন ও উন্নতি তুলনামূলকভাবে কমই হয়। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছেন যে, কলকারখানা, অফিস আদালত ও দোকান পাট থেকে যদি নারীরা সরে যায় তাহলে আজকের যুগের বেকার সমস্যার যেমন অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে তেমনি সামষ্টিক উন্নতির হারও বৃদ্ধি পাবে। আরো দেখা গেছে, যেসব কলকারখানায় নারীদের রাখা হয় না সেসব কলকারখানায় কক্ষনো উৎপাদন হ্রাস দেখা দেয় না বরং সক্ষম ও পরিশ্রমী পুরুষদের কর্মদক্ষতায় উৎপাদন বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

সুতরাং নারীদের দিয়ে পুরুষালী কাজ করিয়ে যারা উন্নয়নের কথা বলেন বা নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেন তাঁরা আসলে মানুষকে প্রবঞ্চিতই করেন। তাদের এই প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়ে নারী ও পুরুষ উভয়েরই অপূরনীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা কেবল তাদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যেই নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে টেনে আনছেন। এতে করে নারীরা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে পড়ছে এবং তার সুফল থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

এটা শুধু আমাদের মুখের কথাই নয়। আজকের পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের অবস্থার পর্যালোচনা করলে আপনারাও একই কথা বলতে বাধ্য হবেন এবং দুনিয়ার সমাজ বিশেষজ্ঞ ও সচেতন পর্যবেক্ষকরা আমাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে প্রায়ই মতামত প্রকাশ করেছেন। যে পাশ্চাত্যে স্বাধীতার ও নারীমুক্তির শ্লোগান সবচেয়ে বেশী উঠে থাকে সে পাশ্চাত্যে নারীদের অধি-

কার ও মান-মর্যাদার কি অবস্থা হচ্ছে ? নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকার কি নিরাপদে আছে ? যদি নিরাপদই থাকবে থাকবে তাহলে এতো হৈ-হল্লা আর চেচামেচি কেন, কেন এতো খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ আর রকমারী নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক খবরাখবরে পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকা আর সংবাদ মাধ্যমগুলো ভরে থাকে ? ইউরোপ-আমেরিকায় নারী নির্যাতনের যত নিষ্ঠুর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে—সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে তার একটি মাত্র তুলনাও পাওয়া যায় না কেন ? তার কারণ মুসলমান জাতি নামেমাত্র হলেও এখনো ইসলামের কোন কোন বিধান মেনে চলছে বলে মুসলিম সমাজে নারীদের অধিকার ও মান-মর্যাদা এখানো নিরাপদ রয়েছে। দুনিয়ার যে কোন জাতীর নারীদের তুলনায় মুসলিম নারী তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে পূর্ণ সন্তুষ্টি ও সম্মানের সাথে জীবন-যাপন করেছ।

কিন্তু জড়বাদী পাশ্চাত্যে নারীমুক্তির শ্লোগান নিছক এক প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুক্তি বা উন্নতির সাথে এও কোন সম্পর্কই নেই। আজকাল পাশ্চাত্যের সচেতন বুদ্ধিজীবি এমনকি পুঁজিপতিরাও একথা স্বীকার করছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের এই মহামারী ব্যাধি নিরাময়ের প্রচেষ্টা গ্রহণের সৎসাহস তাঁদের নেই। ফলে তারা সবকিছু দেখে শুনেও চোখ বুজে সহ্য করছেন। তাছাড়া যথার্থ সংস্কার ও সংশোধনের ফলে তাদের গোটা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী কাঠামোই ধ্বসে পড়বে। কারণ পাশ্চাত্যের উভয় জড়বাদী জীবনদর্শন অর্থাৎ পুজিবাদ ও সমাজবাদ একই বৃক্ষের দুটি বিষফল। এই উভয় জড়বাদী দর্শনই নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বোঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং ইসলাম যখন গোটা বিশ্ব-মানবতার সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে আল্লার দেয়া জীবন-বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান জানায় তখন কায়েমী স্বার্থের শিখণ্ডি এসব পুঁজিপতি এবং সমাজবাদী চক্রই তাদের মুখোশ লুকাতে গিয়ে দাগী অপরাধীদের মতো ইসলামের বিরোধিতা করে।

এখানে আমরা অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক আর উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় পড়তে চাইনা। আসলে আমরা ওসব অপরাধীচক্রের মুখোস উন্মোচন করতে চাই

যারা মুক্তি ও প্রগতির মুখরোচক বুলিতে বিপদগ্রস্থ মানবতাকে তাদের হীন স্বার্থের শিকারে পরিণত করে আসছে। এরাই নারীকে বাজারের পণ্য-বিজ্ঞাপন আর দু'কড়ির বিলাসদ্রব্যে পরিণত করেছে। কাঁচা পয়সার চাকচিক্য দেখিয়ে এরাই নারীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে এবং এরাই নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এরা নারীকে তার মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। এরাই নারীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে চরম অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছে। এই পুঁজিবাদী গোষ্ঠী আর সমাজবাদী চক্র তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন একটি কাজও করেনি যাতে নারী তথা মানবতার কোন কল্যাণ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্যের নারী এসব অপরাধী গোষ্ঠীর হাতের পুতুল সেজে নিজেদের মান-মর্যাদা ও অধিকারকে কাড়ির দামে বিকিয়ে কি নিজেদের সাথে সুবিচার করেছে? আমরা এই প্রশ্নের জবাব চাই। তাঁরা যদি এখন নেশার ঘোরে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন—বা তাঁরা যদি এর জবাব দিতে অপ্রস্তুত হন, তাহলে আমরা অন্য প্রশ্ন করবো যে, তাঁরা কি স্রষ্টার পক্ষ থেকে ন্যাস্ত তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করেছেন? তাঁরা কি তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন?

স্পষ্টতঃ যদি তাঁদের জীবন দাম্পত্য ও মাতৃত্বের মহান উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতির মহত্তম বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থেকে থাকে তাহলে তা সত্যিই আক্ষেপের বিষয়। যদি তাঁরা এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে তাঁদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। ব্যস, যেমন চললো—জীবন কাটিয়ে দেয়া হল! পরিবার-সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তনে তাদের কোন ভূমিকা রইলো না, রইলোনা কোন মহৎ লক্ষ্য।

যেখানে ইচ্ছা যার তার সাথে যৌনতৃপ্তি মেটানোর মধ্যে জীবনের কি মূল্য থাকতে পারে? জীবনে যদি তাদের কোন মূল্য বা মর্যাদাই না থাকে তাহলে তাদের মানুষ হয়ে জন্মানোর অর্থটাই কি থাকবে? তাঁরা যে অবনতির কোন

নিম্নতম তলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সম্ভবতঃ সেই অনুভূতি থেকেও তাঁরা আজ বঞ্চিত। তাঁরা যে কতো হীন-অসহায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন সেই অনুমানও হয়তো তাঁদের নেই

এতো সব বাস্তবতার প্রত্যক্ষ উদাহরণের পরও কি আমাদের চোখ খোলেনি, এবং আমরা কি এখনো এটা বুঝতে পারিনি যে আধুনিক নারী তার নিজের সাথে সুবিচার করছে--না কি অবিচার ?

॥ সমাপ্ত ॥